সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ

সম্পাদনা

অজয় দাশগুপ্ত

শশধর প্রকাশনী
১০/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

Syed Mustafa Siraj

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৯

প্রকাশিকা : রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর প্রকাশনী
১০/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণ : স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১/এ রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ পট :
অঙ্কন : গৌতম রায়
মুদ্রণ : ইমপ্রেশন হাউ

লেখকের অন্যান্য বই

কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
রহস্য রোমাঞ্চ
গোপন সত্য
রূপবতী
বেদবতী
বসন্ত তৃষ্ণা
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
স্বপ্নের মতো
আনন্দমেলা
নিশিলতা
মায়ামৃদঙ্গ
কালো বাক্সের রহস্য
ম্যাকাসিকোর ছায়ামানুষ
বনের আসর
নিঝুম রাতের আতঙ্ক
চোরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর
সবুজবনের ভয়ঙ্কর
জনপদ জনপথ
খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত
হাওয়া সাপ
কাগজে রক্তের দাগ
কর্নেল সমগ্র ১/২/৩/৪/৫/৬
কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
কোকোদ্বীপের বিভীষিকা
হাড্রিম রহস্য
কালো মানুষ নীল চোখ
ভয়-ভুতুড়ে
শ্রেষ্ঠ গল্প
অলীক মানুষ
জিরো জিরো নাইন

এতে আছে

দু'নম্বর চাবি

সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ

দু'নম্বর চাবি

ভদ্রলোকের পরনে ফতুয়া এবং ধুতি। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ। লম্বা নাক। চোখ দুটো টানা-টানা। কাঁচাপাকা চুল খুঁটিয়ে ছাঁটা। কপালে ঘষা খাওয়া রক্তিতিলক। গায়ের রং তামাটে। শক্ত-সমর্থ শরীর। ঘরে ঢুকে করজোড়ে নমস্কার করার সময় তাঁর গিঁটবাঁধা ছোট্ট টিকি চোখে পড়ল। বিনীতভাবে বললেন, আমি বিজয়গড় থেকে আসছি। রানীমা আপনার কাছে একখানা পত্র পাঠিয়েছেন।

বৃদ্ধ প্রকৃতিবিজ্ঞানীর হাতে একটা সচিত্র ক্যাকটাসের বই ছিল। মুখে চুরুট। সাদা দাড়িতে যথারীতি একটুকরো ছাই আটকে ছিল। চওড়া টাকে ঝলমল করছিল প্রতিফলিত সকালের রোদ। বইটা টেবিলে রেখে তিনি সহাস্যে বললেন, কী আশ্চর্য! ভটচাযমশাই না?

প্রৌঢ় ভদ্রলোককে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তিনি হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আজ্ঞে। আমার সৌভাগ্য কর্নেলসায়েব আমাকে এত বছর পরেও চিনতে পেরেছেন।

মোটে তো বছর আষ্টেক হবে। তাছাড়া আপনার চেহারা তেমনি আছে। তো চিঠিটা দিন।

আগন্তুক ভটচাযমশাই ফতুয়ার পকেট থেকে একটা সাদা মুখ আঁটা খাম বের করে কর্নেলের হাতে দিয়ে বললেন, রানীমা আপনাকে চিঠিটা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর লিখে দিতে বলেছেন।

খামের মুখ ছিঁড়ে কর্নেল চিঠিটায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, কুমার বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদ গতবছর খবরের কাগজে দেখেছিলুম। ইচ্ছে ছিল আপনাদের রানীমাকে একটা চিঠি দিই। কিন্তু কেন যেন চিঠিটা আর লেখা হয়ে ওঠেনি। জয়ন্ত! আলাপ করিয়ে দিই। ইনি বর্ধমান জেলার বিজয়গড় রাজবাড়ির পুরোহিত শ্রীহরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। ভটচাযমশাই! আমার এই তরুণ বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক।

আমরা নমস্কার বিনিময় করলুম। ভটচাযমশাই জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন, আর সে রাজত্ব নেই। তবে রাজবাড়ি আছে। লোকেরা এখনও শ্রদ্ধাভক্তি করে। সিংহবাহিনী মায়ের নামে মেলাটাও বসে। ওই সময় যা ধুমধাম হয়। বছরের বাকি সময় খণ্ডহর পুরী। রানীমা একা বুকে আগলে রেখেছেন। তা বয়স প্রায় আশি বছর হতে চলল।

কর্নেল বললেন, ওঁর হাতের লেখা দেখে কিন্তু বয়স বোঝা যায় না। উনি এখন চলাফেরা করতে পারেন তো?

ভটচাযমশাই বললেন, ছড়ি হাতে সারা বাড়ি চক্কর দিয়ে বেড়ান। আর মায়ের আশীর্বাদে এখনও খালি চোখে দেখতে পান। শুধু লেখাপড়ার সময় চশমা দরকার হয়।

রাজবাড়ির সেই ফুলবাগান, ক্যাকটাস এসব টিকে আছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সেদিকে রানীমার খুব দৃষ্টি আছে। মালী সেই কালীপদ এখনও আছে। কালীর বয়সও কম হল না। বছর পাঁচেক হল, রানীমা জোর করে তার বিয়ে দিয়েছেন। সুরবালাকে আপনার মনে পড়বে কর্নেলসায়েব। তারই মেয়ে জবার সঙ্গে কালীর বিয়ে হয়েছিল। একটা বাচ্চা হয়েছে। মায়ের লীলা বোঝা কঠিন।

ভটচাযমশাই আবার হাসবার চেষ্টা করলেন। কর্নেল বললেন, আর আপনি?

আজ্ঞে না। বেশ আছি। মায়ের চরণে পড়ে আছি। সংসার বড় ঝামেলার জিনিস।

কর্নেল চিঠিটার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।

আমি রানীমাকে পইপই করে নিষেধ করেছিলুম কর্নেলসায়েব। বিষয়-সম্পত্তি যা আছে, তা মেলা কমিটির নামে উইল করে রাখুন। রানীমা শুনলেন না। দত্তক নিলেন। তো নিলেন ওঁর দেওরমশাইয়ের সবচেয়ে নচ্ছার ছেলেটাকে। গত মাসে সে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল। আমার সন্দেহ, অলকেন্দু আর বেঁচে নেই। কেউ তাকে গুম করে ফেলেছে।

অলকেন্দুর বয়স কত ছিল?

কর্নেল শান্তভাবে এই প্রশ্নটা করলেন দেখে আমি অবাক।

ভটচাযমশাই বললেন, তা বছর পঁচিশ হবে। কলেজে ফেল করে নেশাভাঙ করে বেড়াচ্ছিল। আপনার কাছে রানীমা লুকোছাপা করতে পারেন। আমি করব না। মেয়েঘটিত ব্যাপার। ভটচাযমশাই চাপা স্বরে ফের বললেন, আপনার মনে পড়তে পারে। নদীর ধারে সেই টিলাটা— নলপাহাড়ি?

হ্যাঁ। টিলার গায়ে একটা বাংলো ছিল। টমসায়েবের বাংলো। সায়েব কি বেঁচে আছেন?

না। তার ছেলে জন চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভে অফিসার। আর মেয়ে আইভি

বিজয়গড় মিশনারি স্কুলে টিচার ছিল। আইভির সঙ্গে অলকেন্দুর মেলামেশা ছিল। আইভির চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছিল। তারপর গত মাসে আইভি চাকরি ছেড়ে চিত্তরঞ্জনে চলে গেল। শুনেছি, সেখানে গিয়ে বিয়ে করেছে স্বজাতির ছেলেকে। এদিকে অলকেন্দু নিখোঁজ।

বাংলোয় এখন কে থাকে?

একজন চৌকিদার থাকে। মাঝে মাঝে জনসায়েব বউ-ছেলেদের নিয়ে ছুটি কাটিয়ে যায়। আইভিকে আর দেখতে পাই না।

কর্নেল বললেন, আপনি বলতে চাইছেন অলকেন্দু--

তাঁর কথার ওপর ভটচাযমশাই বললেন, জনসায়েব সাংঘাতিক লোক। তার অসাধ্য কিছু নেই।

আপনি রানীমাকে এ ব্যাপারে আভাসে কিছু বলেননি?

বলে ধমক খেয়েছিলুম। অলকেন্দুর বাবা রাঁচি থেকে এসে পুলিশকে বলে ছেলেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন। রানীমা তো যথাসাধ্য করেছেন। আপনি জানেন কি না জানি না, রানীমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় পুলিসের ডি আই জি। কিন্তু অলকেন্দুর খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি।

ভটচাযমশাই দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি দয়া করে রানীমাকে যা লেখার লিখে দিন। আমি সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরব। বর্ধমান থেকে অণ্ডাল জংশন। সেখান থেকে গৌরাঙ্গডিহি। তারপর তিন মাইল সাইকেল রিকশা বা বাস, যা পাই। পৌঁছুতে রাত দুপুর। তা-ও যদি পর-পর ট্রেন পাই। নইলে কাল ভোর।

কর্নেল টেবিলের ড্রয়ার থেকে তাঁর প্যাড টেনে বের করলেন। তারপর চিঠি লিখে একটা খামে ঢুকিয়ে আঠা দিয়ে মুখ এঁটে নামঠিকানা লিখলেন। আমার চোখে পড়ল :

'মিসেস বনশোভা সিংহ, রাজবাড়ি,

বিজয়গড়, বর্ধমান'...

ভটচাযমশাই চিঠিটা ফতুয়ার পকেটে ভরে নমস্কার করে উঠলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন।

বললুম, ভদ্রলোককে চা-কফি কিছু খেতে বললেন না যে?

কর্নেল হাসলেন। উনি স্বপাক ছাড়া কিছু স্পর্শ করেন না। তাছাড়া চা-কফি তো বিষ গণ্য করেন। এই যে আমার ঘরে সোফায় বসেছিলেন। বাড়ি ফিরে স্নান করে পোশাক ছেড়ে তবে ঘরে ঢুকবেন।

বিজয়গড়ের রানীমা কী লিখেছেন দেখাতে আপত্তি আছে?

নাহ্। বলে কর্নেল চিঠিটা আমাকে দিলেন। পড়ে দেখলুম :

'শ্রীযুক্ত কর্নেল নীলাদ্রি সরকার সমীপেষু--

মহাশয়,

আশা করি পরম করুণাময় ঈশ্বরের আশীর্বাদে আপনি কুশলে আছেন। আমার স্বর্গত স্বামীর কাগজপত্রের মধ্যে দৈবক্রমে আপনার নাম-ঠিকানা লেখা একখানি কার্ড পাইয়া আপনার কথা মনে পড়িল। তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বিপদে পড়িলে যেন আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি। আমি বর্তমানে বিপদের মধ্যে আছি। সাক্ষাতে বলিব। তবে সাক্ষাতের পূর্বে যদি অঘটন ঘটিয়া যায়, তাহা হইলেও আপনি যেন পশ্চাৎপদ হইবেন না।

ইতি--

বনশোভা সিংহ

রাজবাড়ি, বিজয়গড়

চিঠিটা কর্নেলকে ফেরত দিয়ে বললুম, ভটচাযমশাইয়ের কথার সঙ্গে তাঁর রানীমার কথার সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না।

কর্নেল দাড়ির ছাই ঝেড়ে বললেন, মেলানো যায়। দত্তকপুত্র নিখোঁজ। তারপর এখন রানীমা সম্ভবত এমন কোনও আভাস পেয়েছেন যে, এবার তাঁকেও নিখোঁজ করে দেওয়া হবে। বিষয়-সম্পত্তি থাকার অনেক ঝামেলা।

তাহলে আপনার যাওয়া উচিত।

তোমারও।

আমি গিয়ে কী করব?

কর্নেল চোখ বুজে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য চমকপ্রদ স্টোরি পাবে। আজকাল পাঠকরা কাগজে ক্রাইম-স্টোরি খুব খাচ্ছে। সব কাগজে ক্রাইমের খবরের ছড়াছড়ি।

আপত্তি করে বললুম, ক্রাইম বেড়ে যাচ্ছে বলেই না কাগজে তার খবর বাড়ছে? খবরের কাগজ সমাজের দর্পণ। তাছাড়া মানুষকে সচেতন করে দায়িত্বও তো আছে।

এত যদি বোঝো, তাহলে তৈরি থেকো।

আপনি কবে যাচ্ছেন লিখলেন?

যত শিগগির যাওয়া যায়।

জায়গাটা ঠিক কোথায়?

বাংলা-বিহার সীমানায় একটা নদীর এপারে বিজয়গড়, ওপারে দুমকা জেলার সারংডি। ওই যে জানালার ধারে ক্যাকটাসটা দেখছ, ওটাকে অর্কিডও বলতে পারো।

এপ্রিলে প্রকাণ্ড লাল ফুল ফুটবে। ওটার ফ্যামিলিনেম 'ফিলোক্যাকটাস'। কিন্তু পার্সোনাল নেম 'এপিফাইলাম হাইব্রিডাম'। ওটা এনেছিলুম সারংডির জঙ্গল থেকে। প্রকৃতি কী রহস্যময়ী ডার্লিং! কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। ক্যাকটাস! অথচ জঙ্গলের গাছে ওর বাসা। কাজেই অর্কিড ভেবেছিলুম। কুমারবাহাদুর অমলকান্তি সিংহ আমার ভুল শুধরেছিলেন। প্রায় আট বছর ধরে ওর বংশ জিইয়ে রেখেছি। হাইব্রিড পদ্ধতিতে এপিফাইলামকে নাকি দশ বছর ধরে বংশানুক্রমিক রাখা যায়। আট বছর তো রাখতে পেরেছি!

বেগতিক দেখে হাই তুলে উঠে দাঁড়ালুম। প্রকৃতিবিদ ক্যাকটাস নিয়ে বক্তৃতা শুরু করেছেন। এরপর অর্কিড আসবে। তারপর প্রজাপতি। পাখি। ক্রমে ওঁর সামরিক জীবন। বললুম, আসি কর্নেল! একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। বাড়ি ফেরার পথে সেরে যাব।

এই সময় আবার ডোরবেল বাজল। কর্নেল যথারীতি হাঁক দিলেন, ষষ্ঠী!

একটু পরে পর্দা ঠেলে সবেগে প্রবেশ করলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার-- আমাদের প্রিয় হালদারমশাই। তিনি সোফায় বসে প্রথমে একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর আমার দিকে তাকালেন। আরে! জয়ন্তবাবুও আছেন দেখছি। খাড়াইয়া ক্যান? বয়েন! বয়েন!

বললুম, আপনাকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে হালদারমশাই?

প্লিজ টেক ইয়োর সিট। বলে রুমালে নাক মুছে গোয়েন্দাপ্রবর কর্নেলের দিকে ঘুরলেন। কর্নেল স্যারের লগে কনসাল্ট করতে আইলাম।

কর্নেল বললেন, আগে কফি খেয়ে ধাতস্থ হোন। ষষ্ঠী আপনাকে যখন দেখেছে, তখন আর দফা কফি আসছে। জয়ন্ত! বসে পড়ো।

অগত্যা বসতে হল। কে কে হালদারের পুরো নাম কৃতান্তকুমার হালদার। এক সময় উনি দুঁদে পুলিস অফিসার ছিলেন। রিটায়ার করার পর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খোলেন। ঢ্যাঙা শক্তসমর্থ মানুষ। ছদ্মবেশ ধরতে পটু। তাই মাথার চুলে পালোয়ানি ছাঁট আছে। লম্বাটে মুখের গড়ন। কিন্তু চোখ দুটি তুলনায় ছোট। পাতলা গোঁফের ডগা সুচলো। উত্তেজনা বেশি হলে ডগাদুটো তিরতির করে কাঁপে। ওঁকে কর্নেলের দেখাদেখি আমিও 'হালদারমশাই' বলি। এর পেছনে একটা পুরনো ঘটনা আছে। কলকাতার এক ধনী ব্যক্তির মেয়ের বিয়ের সময় ডাকাতি হওয়ার আশংকা ছিল। পুলিসের ওপর তত ভরসা না করতে পেরে ভদ্রলোক কর্নেলের শরণাপন্ন হন। অবশ্য সাদা পোশাকে পুলিসও মোতায়েন ছিল। কর্নেল প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদারকে কনের মামা সাজিয়ে নিয়ে যান। কর্নেল কোনও সূত্রে টের পেয়েছিলেন, ডাকাতরা বরযাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবে এবং হিরে-মুক্তো-সোনার জড়োয়া

গয়না পরে কনে বিয়ের আসরে এলেই তারা হানা দেবে। তাই বিন্দুমাত্র আভাস পেলেই কর্নেল বলে উঠবেন, 'হালদারমশাই! হালদারমশাই! আপনার ভাগনির চোখে পোকা ঢুকেছে!' এটাই ছিল সঙ্কেত। হালদারমশাই কনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কথাটা শুনেই তিনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে রিভলভার বের করে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কোন কোন হালায় ডাকাত, আমারে দেখাইয়া দ্যান। গুলি করিয়্যা খুলি উড়াইয়া দিমু!' অমনি হইচই শুরু হয়ে যায়। তিনজন ডাকাত ছিল বরযাত্রীদের ভিড়ে। তারা বেগতিক দেখে কেটে পড়ার তালে ছিল। তারা ধরা পড়ে যায়। তবে কে কে হালদার যে কর্নেলের সঙ্কেত বাক্য শুনে সত্যি রিভলভার বের করে ফেলবেন, কর্নেল তা কল্পনাও করেননি। প্ল্যানটা ছিল অন্যরকম। যাই হোক, সেই থেকে কে কে হালদার 'হালদারমশাই' হয়ে ওঠেন কর্নেলের কাছে। তবে আমি এই ঘটনা শুনেই বুঝতে পেরেছিলুম, এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোক বেজায় হঠকারী, বেপরোয়া এবং একরোখা মানুষ। ইংরেজিতে যাকে বলে 'সিন ক্রিয়েট' করা, তা তাঁর মজ্জাগত। পরবর্তীকালে অনেক ঘটনায় তাঁর এই প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। তিনি নিজেও প্রাক্তন পুলিস জীবনের যেসব ঘটনা শুনিয়েছেন, তার মধ্যেও তাঁর একই স্বভাব এবং প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে।

ষষ্ঠীচরণ কফি আনার পর হালদারমশাই বললেন, ভেরি ভেরি মিসটিরিয়াস কেস কর্নেল স্যার! ক্লায়েন্টের অ্যাডভান্স পাইলাম। বাট শি হ্যাজ বিন ভ্যানিশ্ড্!

বললুম, কোনও মহিলা ক্লায়েন্ট?

হালদারমশাই কফি খেতে খেতে বললেন, মেমসায়েব। মিসেস আই জে নিউসন।

কর্নেল যেন একটু চমকে উঠলেন। বললেন, নিউসন?

গোয়েন্দামশাই আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, আপনি চেনেন?

নাহ্। তবে নিউসন নামটা কবে যেন শুনেছিলুম। কোথায় তা মনে নেই।

হালদারমশাই কফিতে ফুঁ দিয়ে প্লেটে ঢেলে খেতে শুরু করলেন। তারপর তিনি যে ঘটনা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

সম্প্রতি তিনি কলকাতার সব দৈনিকে তাঁর ডিটেকটিভ এজেন্সির বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপন দিলেই দু-একটা কেস তাঁর হাতে আসে। গতকাল দুপুরে হোটেল এশিয়া থেকে মিসেস আই জে নিউসন নামে এক মেমসায়েব ফোন করে তাঁর ফি জানতে চান। হালদারমশাই বলেন, কেস অনুযায়ী তিনি ফি নেন। তবে অগ্রিম পাঁচশো টাকা না দিলে তিনি কেস নেন না। মেমসায়েব তাঁকে বিকেল চারটে নাগাদ হোটেলের সাততলায় ৭০৭ নম্বর স্যুইটে দেখা করতে বলেন। হালদারমশাই গতকাল চারটেয় গিয়ে রিসেপশনিস্টকে মেমসায়েবের সঙ্গে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা জানান। মহিলা রিসেপশনিস্ট তাঁর নাম জানতে চান। নাম বলার পর মহিলা

তাঁকে একটা মুখআঁটা খাম দিয়ে বললেন, মিসেস নিউসন আধ ঘণ্টা আগে তাঁর স্বামীর সঙ্গে হোটেল থেকে চেক-আউট করেছেন।

হালদারমশাই হোটেলের বাইরে এসে খামের মুখ ছিঁড়ে দেখেন, তাতে একটা পাঁচশো টাকার নোট এবং একটা চিঠি আছে। চিঠিতে লেখা আছে : 'একস্ট্রিমলি সরি। দা স্কাউন্ড্রেল হ্যাজ ট্রেসড মি। সো উই আর গোয়িং টু অ্যানাদার প্লেস। আই উইল কন্ট্যাক্ট উইদ ইউ ইন টাইম।' চিঠির তলায় নামসই। সবটাই সবুজ কালিতে সিগনেচার পেনে লেখা।

যাই হোক, হালদারমশাই ধাঁধায় পড়েছেন। গণেশ অ্যাভেনিউতে তাঁর এজেন্সি অফিসে যাওয়ার পথে তিনি কর্নেল স্যারের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছেন।

কর্নেল তাঁর কথা শোনার পর বললেন, নিউসন দম্পতি কোনও বদমাস লোকের হাত থেকে বাঁচতে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। অথচ তাকে পুলিসে ধরিয়ে দিচ্ছেন না। আপনার সাহায্যে লোকটাকে জব্দ করার উদ্দেশ্য আছে বলেও মনে হচ্ছে না। কলকাতায় গুণ্ডা মস্তানের অভাব নেই। তাদের ভাড়া করলেই হত।

ঠিক। হালদারমশাই মাথা নাড়লেন। ঠিক কইছেন কর্নেল স্যার! দিস ইজ দা মিস্ট্রি।

বেশ তো। আপনি অফিসে গিয়ে অপেক্ষা করুন। মেমসায়েব তো লিখেছেন, যথাসময়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

করব। কিন্তু তাঁর হাজব্যান্ডই বা কেমন? ওয়াইফেরে বাঁচাইতে পারেন না ক্যান?

যথাসময়ে নিশ্চয় তা জানতে পারবেন। অগ্রিম ফি যখন পেয়ে গেছেন।

ঘড়ি দেখে গোয়েন্দাপ্রবর উঠলেন। তারপর অভ্যাসমতো 'যাই গিয়া' বলে সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

দেখলুম, কর্নেল ড্রয়ার থেকে কাগজপত্র হাতড়ে একটা খুদে জীর্ণ নোটবই বের করলেন। তারপর সেটার পাতা ওলটাতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি মুখ তুলে বললেন, আশ্চর্য জয়ন্ত! আশ্চর্য!

কী আশ্চর্য?

কোইনসিডেন্স। কিংবা আকস্মিকতা। নিউসন নামটা শুনেই আমার একটু চমক জেগেছিল। এখন দেখছি, আমার স্মৃতি ভুল করেনি। টমাস নিউসন! জয়ন্ত! বিজয়গড়ের কাছে নলপাহাড়ি টিলার সেই বাংলোটা টমাস নিউসনের। লোকে তাঁকে বলত টমসায়েব। এখন কথা হল, হালদারমশাইয়ের মক্কেলের নামের পদবি নিউসন। টমসায়েবের সঙ্গে কি এই মহিলার কোনও সম্পর্ক আছে?

নড়ে বসলুম। কর্নেল! ভটচাযমশাই আইভি নামে একটি মেয়ের কথা বলছিলেন।

আইভির আদ্যাক্ষর আই। অলকেন্দুবাবু নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে তার নাকি সম্পর্ক আছে।

হুঁ। টমসায়েবের মেয়ে। জয়ন্ত! এক মিনিট। হোটেল এশিয়ার ম্যানেজার আমার পরিচিত। তাঁকে রিং করা যাক। বলে কর্নেল রিসিভার তুলে ডায়াল করতে থাকলেন। সাড়া পেয়ে বললেন, প্লিজ পুট মি টু ম্যানেজার মিঃ রাঘবন। ... আই অ্যাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। ...ইয়েস। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। এন ফর নাইট... ওকে। ওকে! ...মিঃ রাঘবন! মর্নিং! প্লিজ লেট মি নো অ্যাবাউট মিসেস আই জে নিউসন। সেভেন্থ ফ্লোর। স্যুইট নাম্বার সেভেন ও সেভেন। শি হ্যাজ বিন চেকড্ আউট। ...ইয়েস। দ্যাট আই নো। বাট আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট হার হ্যাজব্যান্ড। ওয়াজ হি এ হোয়াইটম্যান? ... ইউ আর শিওর? ...থ্যাঙ্কস মিঃ রাঘবন! ... ও নো নো। নাথিং টু বি ওয়ারিড। থ্যাঙ্কস এগেন।...

ফোন রেখে কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বসলেন, মেমসায়েবের স্বামী দিশি সায়েব। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। জয়ন্ত! রহস্য ঘনীভূত হল দেখছি। বলে তিনি চুরুট ধরালেন।...

।। দুই ।।

সেদিন সন্ধ্যায় দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসে পুলিস সূত্রে পাওয়া একটা খবর লিখছি, সেই সময় কর্নেলের ফোন এল। জয়ন্ত! তুমি কি ব্যস্ত?

বললুম, তত কিছু ব্যস্ত নই। খবর বলুন?

কর্নেলের হাসি ভেসে এল। তোমার লেখার মতো খবর নয়। হালদারমশাই কিছুক্ষণ আগে ফোনে বললেন, মেমসায়েব তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি মক্কেলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন।

তারপর?

তারপর আর কিছু জানি না। তবে আমাদের আজ রাত দশটা পনেরোর ট্রেনে রওনা হতে হবে। টিকিটের ব্যবস্থা করে ফেলেছি। অতএব তুমি এখনই সল্টলেকে তোমার ফ্ল্যাটে গিয়ে তৈরি হয়ে এসো।

আমি কিন্তু তৈরি হয়েই এসেছি কর্নেল। শুধু গাড়িটা রাখার প্রবলেম।

নো প্রবলেম। আমার গ্যারাজটা তো খালি। আমার ল্যান্ডরোভার গাড়িটা বেচে দিয়ে নতুন গাড়ি কেনা হয়ে উঠল না। তো যে ভদ্রলোককে গ্যারাজে গাড়ি রাখতে

দিয়েছিলুম, তিনি অন্যত্র বাড়ি করে চলে গেছেন। কাজেই-- হ্যাঁ! তুমি যত শিগগির পারো, চলে এসো। ছাড়লুম।...

সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে পড়লুম। চিফ অব দি নিউজ ব্যুরো সত্যদাকে আভাস দিয়ে এলুম, কর্নেলের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারে বেরচ্ছি। সত্যদা খুশি হয়ে বললেন, বড় মাছ ধরলে ডাবল ইনক্রিমেন্ট। পুঁটিমাছ হইলে ইনক্রিমেন্ট স্টপ। আমি যা কইলাম বুড়ারে কইয়ো।

রাস্তায় জ্যাম ছিল। নভেম্বরের সন্ধ্যা। কলকাতায় শীত পড়েনি। আবহাওয়া মনোরম। ইলিয়ট রোডে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুতে পয়ঁতাল্লিশ মিনিট লেগে গেল। অথচ অফিস থেকে হেঁটে গেলে কুড়ি মিনিটের বেশি লাগে না।

ব্যাগেজ কাঁধে লটকে ড্রয়িং রুমে ঢুকলুম। তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে ব্যাগেজের ভারে হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। দেখলুম, হালদারমশাই এসে গেছেন। হাতমুখ নেড়ে কথা বলছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, হেভি মিস্ট্রি জয়ন্তবাবু!

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ব্যাগে অত সব কী নিয়েছ?

বললুম, তেমন কিছু না। তবে খানকতক বই নিয়েছি। বইগুলোর ওজন এত হবে, বুঝতে পারিনি।

বই? বই কী হবে?

পড়ব। কারণ আপনি পাখি-প্রজাপতি-অর্কিডের পেছনে ছুটে বেড়াবেন, এ তো জানা কথা। তখন বই পড়ে সময় কাটাব।

কর্নেল তুম্বো মুখে বললেন, বইগুলো রেখে যাও। এটা নিছক ভ্রমণ নয়, জয়ন্ত! তোমার লাইসেন্সড ফায়ার আর্মসটা নিয়েছ তো?

তা অবশ্য নিয়েছি।

তা-ই যথেষ্ট। বলে কর্নেল হালদারমশাইয়ের দিকে ঘুরলেন। তাহলে লোকটা আপনাকে লিটারাল্যালি ল্যাং মেরে পালিয়ে গেল?

হঃ। বলে হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিলেন। জায়গাটা স্লিপারি। জুতা স্লিপ না করলে পড়তাম না। হালার চুল না ধইরা জামার কলার ধরা উচিত ছিল। হালা যে পরচুলা পরছে, বুঝি নাই।

হালদারমশাই তাঁর হ্যান্ড-ব্যাগ থেকে একটা ঝাকড় মাকড় পরচুলা বের করে দেখালেন।

বললুম, কেসটা কী হালদারমশাই?

কর্নেল বললেন, পরে আমার মুখে শুনে নিও। হালদারমশাই! আপনি তা হলে আর দেরি না করে ক্লায়েন্টের সঙ্গে আবার দেখা করুন। তারপর যা করার তা আপনাকে বলেছি। হ্যাঁ, পরচুলাটা দিয়ে যান।

হঃ। যাই গিয়া। বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ পরচুলাটা দিয়ে সবেগে প্রস্থান করলেন।

ষষ্ঠীচরণ আমার জন্য কফি আনল। কর্নেল তাকে বললেন, ন'টায় ডিনার খেয়ে আমরা বেরুব। রিস্ক্ নেব না। বাবুঘাটে লঞ্চে চেপে হাওয়া স্টেশনে যাব। ব্রিজে জ্যাম হতে পারে।

কফি খেতে খেতে বললুম, হালদারমশাই কার কাছে ল্যাং খেয়ে পরচুলা পেলেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, নিউসন দম্পতি শেয়ালদার কাছে একটা হোটেলে আছে। হালদারমশাইকে সন্ধ্যা ছ'টায় ডেকেছিল মিসেস নিউসন। সেখানে গেলে মিসেস নিউসন ঘর থেকে বেরিয়ে নীচের একটা গলিতে হালদারমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে আসে।

ঘরে কথা না বলে রাস্তায় কেন?

জানি না। তো গলিতে ওঁরা যেই নেমেছেন, একটা লোক আচমকা মিসেস নিউসনের গলার মিহি চেন ধরে ফেলে। চেনে একটা লকেট আছে। হালদারমশাই ছিনতাইকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। লোকটা তাঁর পায়ে লাথি মারে। উনি আছাড় খান। তবে চুলটা ছাড়েননি। লোকটা তক্ষুণি পালিয়ে যায়। চুলটা হালদারমশাইয়ের হাতে থেকে যায়। সেটা তো দেখলে!

তারপর?

হালদারমশাই লক্ষ্য করেন, মিসেস নিউসন চেনের লকেটটা মুঠোয় চেপে ধরে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে। হালদারমশাই তাকে অনুসরণ করেন। তখন সে বলে, আপনি ঘণ্টা দুই পরে এসে দেখা করবেন।

ঘণ্টা দুই পরে কেন?

তা জানি না। হালদারমশাই ওখানে ঘণ্টা দুই সময় কাটাতে পারতেন। তা না করে তিনি আমার কাছে ছুটে এসেছিলেন। কেন জানো? পরচুলাটা দেখাতে। অদ্ভুত মানুষ! ওখান থেকে ফোন করেও জানাতে পারতেন। তবে আপাতদৃষ্টে পরচুলাটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে আমার।

বলে কর্নেল তার ভেতরটা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় আতস কাচ দিয়ে দেখতে থাকলেন। একটু পরে বললেন, হ্যাঁ। গুরুত্বপূর্ণ। হালদারমশাই এটা এনে ভুল করেননি দেখছি। আসলে তখন উনি আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় ওঁকে জানিয়েছিলুম সাড়ে ন'টায় আমি বেরোচ্ছি। তাই উনি রিস্ক নেননি। ছুটে এসেছিলেন।

কী আছে ওটার ভেতর?.

একটু লাল ছোপ। লোকটার মাথায় হয়তো ঘা বা ফোড়া আছে।

হতাশ হয়ে বললুম, তা হলে ওটা কী এমন গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বসুদ্ধু লোকের মাথা

খুঁজে বেড়াতে হবে, কার মথায় ঘা বা ফোড়া আছে।

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। মুখের চুরুট নিভে গিয়েছিল। টেবিলে অ্যাসট্রেতে রেখে পরচুলাটা খবরের কাগজ ছিঁড়ে একটা মোড়ক বানালেন। তারপর বললেন, আমি তৈরি হয়ে নিই।

কর্নেল ভেতরে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে টেলিফোন বাজল। ফোন তুলে সাড়া দিতে গিয়ে মনে পড়ল, কর্নেলের বেডরুমে এটার এক্সটেনশন লাইন আছে। তারপরই হালদারমশাই এবং কর্নেল দু'জনের কথাবার্তা আমার কানে এল। ফোন রেখে দিলুম না। শোনা যাক না ব্যাপারটা।

কর্নেল স্যার! হালদার কইতাছি।

পাবলিক বুথ থেকে মনে হচ্ছে হালদারমশাই?

ঠিক ধরছেন। মেমসায়েব আবার ভ্যানিশড।

হোটেল থেকে চলে গেছেন?

হ্যাঁ। কী ফালতু ঝামেলায় পড়া গেল। কী করি কন তো?

হয়তো ভয় পেয়ে মেমসায়েব আবার কোথাও গিয়ে উঠেছে। আপনার কার্ডে বাড়ির নাম্বার তো আছে। আপনি বাড়ি চলে যান। আমার ধারণা মেমসায়েব আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ছাড়ি?

গোয়েন্দামশাইয়ের আর কোনও সাড়া এল না। টেলিফোন রেখে দিলুম। একটু পরে কর্নেল পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে চোখ কটমটিয়ে বললেন, আড়িপাতা ব্যাড হ্যাবিট।

হেসে ফেললুম। আড়ি পেতে একটু মজা পেলুম বস্! হালদারমশাই জীবনে বোধহয় এমন মক্কেলের পাল্লায় পড়েননি।

কর্নেলও হেসে ফেললেন। এত ওঁকে বলি, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখুন। উনি বলেন, আমি একাই একশো। এখন দেখো, যদি ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকত তাকে উনি শেয়ালদার ওই হোটেলে রেখে আসতে পারতেন। অ্যাসিস্টান্ট মেমসায়েবকে ফলো করত। নাহ্। আর দেরি করা ঠিক নয়।

রাত সাড়ে ন'টায় বেরিয়েছিলুম দু'জনে। কর্নেলের নির্দেশে বইগুলো রেখে আসায় আমার ব্যাগেজ হালকা হয়েছিল। কর্নেলের গলায় বাইনোকুলার আর ক্যামেরা। পিঠেআঁটা কিট বাগ। তার চেনের ফাঁকে প্রজাপতি ধরা নেটের হ্যান্ডেল ছাতার বাঁটের মতো বেরিয়ে আছে। মাথায় যথারীতি টুপি পরেছেন। গায়ে জ্যাকেট চড়িয়েছেন। আমাকেও শীতের পোশাক পরতে হয়েছিল। বিজয়গড় এলাকায় নাকি এখনই প্রচণ্ড শীত। কর্নেলের হাতে আর একটা ব্যাগ দেখে বুঝতে পেরেছিলুম, ওতে জঙ্গলে যাবার পোশাক-আশাক তো আছেই, উপরন্তু ওঁর ফোটোপ্রিন্টের সরঞ্জামও

আছে। একটা বাথরুমকে সর্বত্র উনি ডার্করুমে পরিণত করে ফেলেন। ট্রেন ছেড়েছিল ঠিক দশটা পনেরো মিনিটে। ফার্স্ট ক্লাসে রিজার্ভড কুপে দুটো বার্থ ওপরে-নীচে। নীচে কর্নেল। ওপরে আমি। উল্টোদিকে এক মারোয়াড়ি দম্পতি। কর্নেল হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে জানিয়ে দিয়েছিলেন, আমরা চিত্তরঞ্জন স্টেশনে নামব। অণ্ডাল হয়ে যেতে ট্রেন বদলানোর ঝামেলা আছে। দিল্লিগামী মেল ট্রেন। তাই মধ্যে মাত্র দুটো স্টপ। বর্ধমান আর আসানসোল। তারপরের স্টপ চিত্তরঞ্জন। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ পৌঁছনোর কথা।

ট্রেন জার্নিতে আমার ঘুম হয় না। বার তিনেক বাথরুমে গিয়েছিলুম। একবার বাথরুম থেকে এক যুবতী মেমসায়েবকে দেখে চমকে উঠেছিলুম। পরনে জিনস, লাল শার্ট, জিনসের জ্যাকেট। আইভি নয় তো? পরে দেখি আর এক যুবতী মেমসায়েব এসে তার সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় কিচিরমিচির জুড়ে দিল। দু'জনেই সিগারেট ধরাল। আর একবার এক ধারালো চেহারার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা যুবককে দেখে ভেবেছিলুম, আইভির সেই সঙ্গী নয় তো? আমাকে নিরাশ করে এক বাঙালি যুবতী একটি বাচ্চাকে নিয়ে কুপে থেকে বেরিয়ে তাকে বলেছিল, বাবুইকে বাথরুমে নিয়ে যাও তো!

ট্রেন আসানসোল ছাড়িয়ে যাবার পর করিডর খাঁ-খাঁ নিঝুম। সব কুপের দরজা বন্ধ। বাথরুম থেকে এসে শুয়ে পড়েছিলুম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। সেই ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকে। নেমে পড়ো। চিত্তরঞ্জন এসে গেল। পনেরো মিনিট লেট।

নির্জন প্ল্যাটফর্মে দু'জনে নেমে একটা চায়ের স্টলে গেলুম। কিন্তু চা এখনই মিলবে না। কর্নেল একটা খালি বেঞ্চে বসে বললেন, ফ্লাস্ক আনতে ভুলে গেছি। ষষ্ঠী বরাবর ফ্লাস্কে কফি তৈরি করে রাখে। সে-ও ভুলে গেল?

এই সময় কেটলি আর প্লেটে মাটির ভাঁড় সাজিয়ে প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্ত থেকে এক চাওয়ালা এসে গেল। সারাক্ষণে আঁচে বসিয়ে রাখা কেটলির তরল পদার্থের স্বাদ তীব্র হিম শেষরাতে অমৃত মনে হচ্ছিল। দেখলুম কর্নেলও তারিয়ে তারিয়ে সেই অমৃত পান করে চুরুট ধরালেন। বললেন, এক ঘণ্টা অপেক্ষা করো। স্টেশনের বাইরের রাস্তায় বিজয়গড় যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে। মিনিট চল্লিশ লাগার কথা। তবে আট বছর আগে যে অবস্থা ছিল, এখন তা বদলে যেতেই পারে। তুমি সাংবাদিক। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা দেখার আমন্ত্রণ পাওনি কখনও?

বললুম, হ্যাঁ। বছর পাঁচেক আগে এসেছিলুম। ওহ্! হরিবল্ অভিজ্ঞতা!

কেন?

ইঞ্জিন তৈরির কারখানায় ঢুকে কানের অবস্থা-- ওহ্ আমার শুধু মনে হচ্ছিল, এই ভয়ঙ্কর শব্দের মধ্যে যারা কাজ করে, তারা কি যন্ত্রমানুষ হয়ে আছে? কারখানার

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে একখানা ঝাঁঝালো রিপোর্টাজ লিখেছিলুম। সত্যি কর্নেল! বিদেশেও কলকারখানা দেখে এসেছি। এ দেশের কলকারখানায় মানুষকে নিঙড়ে ছোবড়া করে দেওয়া হয়। একেবারে-- যাকে বলে ডিহিউম্যানাইজেশন--

কর্নেল আমার কথার ওপর সহাস্যে বললেন, বিহারি শীতের আক্রমণ থেকে বাঁচতে তুমি বক্তৃতা শুরু করলে ডার্লিং! এই স্থানটি কিন্তু বিহার। তা জানো তো? কয়েক পা হেঁটে উত্তরে গেলেই পশ্চিমবঙ্গ। যাই হোক, তুমি গা গরম করতে থাকো।

বললুম, নাহ্! তত কিছু ঠাণ্ডা লাগছে না। আসলে সেই স্মৃতিটা বড্ড তেতো।

কিছুক্ষণ পরে একটা ডাউন ট্রেন এল। একদল আদিবাসী ভিড় করে নামল। তারপর তারা নিজেদের ভাষায় কথা বলতে বলতে চলে গেল। নানা বয়সের মানুষ। ওরা হাঁটতে হাঁটতেই যাবে, তা বোঝা যাচ্ছিল। ততক্ষণে চায়ের স্টলের একটি লোক কেরোসিন স্টোভ ধরিয়ে কেটলি চাপিয়েছে। কর্নেল তা লক্ষ্য করে বললেন, আর এক ভাঁড় চা খেয়ে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব।

চাওয়ালার কাছে খবর নিয়ে জানা গেল, বিজয়গড় যাওয়ার বাস এখন সকাল সাতটায় ছাড়ে। কারণ গত বছর জঙ্গলের রাস্তায় ভোরের বাসে ডাকাতি হয়েছিল। তারপর থেকে সময় বদলানো হয়েছে। তবে যদি আমরা আগে যেতে চাই, ট্রাক পেতে পারি। বিজয়গড়ের ওদিকে একটা পাথরখাদান আছে। কয়েকটা ট্রাক মজুরদের নিয়ে ভোরবেলা সেখানে যায়। বিকেলে ফিরে আসে পাথরকুচি বা স্টোন চিপস নিয়ে।

সৌভাগ্যক্রমে একটা ট্রাকে জায়গা পাওয়া গেল। তখনও কুয়াশা-মেশানো আঁধার চরাচর ঢেকে রেখেছে। অসমতল খোলা মাঠ, চড়াই-উৎরাই, তারপর টানা জঙ্গল পেরিয়ে আবার ঢেউখেলানো মাঠ এবং আদিবাসী বসতি পেরিয়ে যাওয়ার পর দিনের আলো ফুটল বটে ; কিন্তু কুয়াশা এত গাঢ় যে পরিবেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। একখানে ট্রাকটা থেমে আমাদের নামিয়ে দিল। সেখানে একটা ছোট বাজার। ড্রাইভার বলল, ইঁহাসে আধা কিলোমিটার। পায়দল মাত্ যাইয়ে। রিকশা-টাঙ্গা সব কুছ মিলেগা ইঁহা।

ড্রাইভারটি খুবই ভদ্র। কিছুতেই ভাড়া নিল না। বখশিস হিসেবেও না। কর্নেল বললেন, চিনতে পেরেছি। জায়গাটার নাম উরনপুর। আট বছর আগে এখানে জঙ্গল ছিল। আদিবাসীদের হাট বসত। আরে আশ্চর্য! টিলার গায়ে কত ইটের বাড়ি উঠেছে।

তিনটে ট্রাক থামিয়ে ড্রাইভার এবং তিনদল মজুর হই হই করে চায়ের দোকানগুলোতে গিয়ে ভিড় জমাল। কর্নেল একটা সাইকেল রিকশ ডেকে উঠে বসলেন। আমি তাঁর প্রকাণ্ড শরীরের চাপে সেঁটে গেলুম। কর্নেল বললেন, বিজয়গড় রাজবাড়ি। কত ভাড়া নেবে?

রিকশাওয়ালা বলল, বিশ রুপৈয়া।

ঠিক হ্যায়।

ততক্ষণে কুয়াশার গায়ে রক্তিম রোদ পড়েছে। দু'ধারে গাছের সারি। তার ফাঁকে অনাবাদি মাঠের ওপর নানা গড়নের প্রকাণ্ড সব পাথর পড়ে আছে। কিছুটা চলার পর ফসলের জমি চোখে পড়ল। রাস্তাটা পিচের এবং মসৃণ। বুঝলুম এটাই বাস রাস্তা। ট্রাকগুলো যাবে অন্যদিকে।

ক্রমে একটা শহরের অস্পষ্ট ছবি সামনে ফুটে উঠল। রিকশা বাঁদিকে সংকীর্ণ খোয়াঢাকা পথে বাঁক নিল। কর্নেল বললেন, কিছু চেনা যাচ্ছে না। মাত্র আট বছরে এত বেশি পরিবর্তন। অবশ্য সবখানেই এমনটি হয়েছে।

এবার রিকশাওয়ালা নেমে রিকশা ঠেলতে থাকল। কিছুটা চড়াই। তারপর সমতল পথ। কিন্তু দু'দিকে শুধু ধ্বংসাবশেষ, পাথর আর ঝোপ-জঙ্গল। কর্নেল গাইডের ভঙ্গিতে বললেন, প্রাচীন বিজয়গড়ের স্মৃতিচিহ্ন লক্ষ্য করো জয়ন্ত! এটা একটা ঐতিহাসিক জায়গা।

মোরাম রাস্তাটা সোজা এগিয়ে গেছে। ডাইনে ঘুরেই দেখি, সামনে একটা ভেঙেপড়া তোরণ। রিকশাওয়ালা বলল, আগেয়া সাব!

ভাড়া মিটিয়ে কর্নেল পা বাড়ালেন। ভাঙা তোরণের পর কাঠের বেড়া। কর্নেল সেখানে গিয়ে ডাকলেন, কালীপদ! কালীপদ!

একজন প্রৌঢ় দৌড়ে এসে কর্নেলকে দেখে গেট খুলে সেলাম দিয়ে বলল, আসুন স্যার। রানীমা বলেছেন আপনি যে কোনও সময়ে এসে পড়বেন।

তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ দেখছি!

আপনাকে কি ভুলতে পারি স্যার?

বাঁদিকে একটা পুরনো দোতলা লম্বাটে বাড়ি। ইতালীয় ভাস্কর্যের আদলে তৈরি ডানদিকে পোড়ো ফোয়ারা এবং ঝলমলে ফুলবাগান। সামনে পূর্বে একটা মন্দির মন্দিরের দিক থেকে এক বৃদ্ধা ছড়ি হাতে এগিয়ে আসছিলেন। তাঁর সাদা চুল খোলা সদ্য স্নান করে মন্দিরে হয়তো পুজো করতে গিয়েছিলেন। তাঁর পেছনে ঘোমটাটান একটি যুবতী মেয়ে। কালীপদ চেঁচিয়ে উঠল, রানীমা! কর্নেলসায়েব এসেছেন!

বৃদ্ধা করজোড়ে নমস্কার করে বললেন, আমি জানি। চিঠি পেয়ে আপনি না এসে পারবেন না।

কর্নেল বললেন, আপনি কেমন আছেন বলুন?

বৃদ্ধা হাসলেন। লিখেছি তো সে কথা। আমাকে আপনি যে কষ্ট করে দেখতে এলেন, তার চেয়ে বড় কথা আমি আপনাকে দেখতে পেলুম। ওরে কালী কর্নেলসায়েবের ঘর গুছিয়ে রেখেছিস তো?

কালীপদ বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ রানীমা!

কর্নেলসায়েব! আগে গিয়ে রেস্ট নিন। জবা! তুই আমার সঙ্গে আয়। তোকে দেখিয়ে দিই কীভাবে কফি তৈরি করতে হয়। ওরে! কর্নেলসায়েব কফির খুব ভক্ত।

কর্নেল বললেন, আমার চিঠি পেয়েছেন তো?

বৃদ্ধা পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। হরেকেষ্ট ফিরলে তো চিঠি পাব।

সে কী! উনি এখনও ফেরেননি?

না। হয়তো আসানসোলে বোনের বাড়িতে গেছে। বলছিল, ফেরার পথে ওখান হয়ে আসব। বললুম, তা আসিস। কর্নেলসায়েব আমার চিঠি পেলেই হল। বলে আমার দিকে তাকালেন। এই ছেলেটিকে তো চিনতে পারলুম না?

কর্নেল বললেন, এর নাম জয়ন্ত চৌধুরী। দৈনিক সত্যসেবকের সাংবাদিক।

কে জানে কেন, তখনই বৃদ্ধার পায়ে প্রণাম করলুম। উনি আশীর্বাদ করে বললেন, কালী! এঁদের নিয়ে যা।

কালীপদ আমাদের নিয়ে যেতে যেতে চাপা স্বরে বলল, রানীমার কাছে আবার উড়ো চিঠি এসেছে। এই নিয়ে তিনবার। উনি নিজেই বলবেন সব কথা। তবে আপনাকে দেখে আমার সাহস বেড়ে গেল স্যার।...

।। তিন ।।

কর্নেলের সঙ্গী হয়ে এমন অনেক রাজবাড়িতে থেকেছি। কিন্তু এ যেন এক 'যক্ষপুরী'। নীচের তলায় পশ্চিম প্রান্তে একটা বড় ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্নেলকে 'যক্ষপুরী' কথাটা বলায় উনি হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ। এই ফিলিংটা আমারও হচ্ছে। তবে আট বছর আগে কুমার বাহাদুর বেঁচে থাকার সময় বাড়ির অবস্থা এমন ছিল না। সারাদিন জমজমাট হয়ে থাকত। এ ধরনের ফ্যামিলিতে অনেক পরগাছা এসে জোটে। মিসেস সিংহ দেখছি সব নির্মূল করে ফেলেছেন। তারাও শত্রুতা করতে পারে। যাই হোক, আগে কফি খেয়ে চাঙ্গা হওয়া যাক।

কালীপদ ট্রেতে কফির পট, কাপ-প্লেট আর বিস্কুট আনল। সে বলল, সেবার আপনি এর ওপরতলায় ছিলেন। ওই ঘরটা বাচ্চুবাবুর খুব পছন্দ। তাই ঘরটা উনি বেছে নিয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন, বাচ্চুবাবু কে?

আজ্ঞে, ছোট কুমার বাহাদুরের ছেলে অলকেন্দুবাবু। ছোট কুমার বাহাদুর নিজের

অংশ দাদাকে বেচে দিয়েছিলেন। উনি, রাঁচিতে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। শ্বশুরমশাইয়ের সব সম্পত্তি ভোগ করছেন। ওঁর দুই ছেলে। পুলকেন্দু আর অলকেন্দু। পুলকেন্দুবাবু ইঞ্জিনিয়ার। অলকেন্দুবাবু কলেজে ফেল করে বাউন্ডুলে হয়ে পড়েছিলেন। রানীমার কী খেয়াল হল, তাঁকে দত্তক নিলেন।

ভটচাযমশাইয়ের কাছে শুনলুম, বাচ্চুবাবু গত মাসে নাকি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেছেন?

কালীপদ গম্ভীর মুখে বলল, হ্যাঁ। কালীপুজোর রাতে পুজো দেখতে গিয়েছিলেন। তারপর আর পাত্তা নেই। তবে বলতে নেই স্যার, রানীমা মুখে যাই বলুন, তাঁর হাড় জুড়িয়েছে। হাবভাবে তো বুঝতে পারি। বাচ্চুবাবু তাঁর ঘরে সারারাত বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মদ খেতেন আর গান বাজাতেন। কান ঝালাপালা হয়ে যেত। রানীমার সাধ্য ছিল না তাঁকে সামলান।

রানীমা তো তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য যথাসাধ্য করেছেন শুনেছি!

তা করেছেন। একটা দায়িত্ব তো বটে! পুলিস সায়েব-- মানে ডি আই জি রানীমার পিসতুতো ভাইয়ের ছেলে। অরবিন্দ বোস নাম। বর্ধমানে তাঁর অফিস। গত সপ্তাহে তিনি এসে বলে গেছেন, তাঁর হাতে খবর আছে বাচ্চুবাবুকে খুন করে লাশ কোথাও পুঁতে ফেলেছে খুনীরা। সেই খুনীদের তিনি শিগগির অ্যারেস্ট করবেন।

তা শুনে রানীমা নিশ্চয় খুব কান্নাকাটি করলেন?

কালীপদ চাপা স্বরে বলল, আজ্ঞে না। আপনি তো দেখেছেন। উনি খুব ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে। একেবারে পাষাণ-পাথর। বোসসায়েবের কথা শুনে শুধু একটা কথা বললেন। 'খুনীদের ধরার আগে আমাকে বাচ্চুর লাশটা এনে দেখাও।' এ কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝিনি স্যার।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, তুমি উড়ো চিঠির কথা বলছিলে?

কালীপদ আগের মতো চাপা স্বরে বলল, গেটের ফাঁক দিয়েকে ফেলে গিয়েছিল আমি স্যার একটু-আধটু লেখাপড়া জানি। লাল ডটপেনে লেখা চিঠি। বাচ্চুবাবু নিখোঁজ হওয়ার পর গত তিন সপ্তায় তিনটে চিঠি। একই কথা লেখা।

এই সময় রানীমার সাড়া পাওয়া গেল। কালী! কর্নেলসায়েবদের জন্য ব্রেকফাস্ট রেডি করতে হবে না? তুই গিয়ে জবাকে সাহায্য কর।

কথা বলতে বলতে উনি পর্দা তুলে ঘরে ঢুকলেন। কালী বলল, ট্রে গুছিয়ে নিচ্ছি রানীমা! সায়েবদের কফি খাওয়া হয়ে গেছে।

সে ট্রে গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল। রানীমা একটা চেয়ারে বসে ছড়িটা পাশে ঠেক দিয়ে রাখলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, কালীটা বড্ড কথা বলে। আসলে ও ব্যাপারটা বুঝতে পারি। কথা বলার লোক এ বাড়িতে আর পায় না। এক

হরেকেষ্ট। তবে হরেকেষ্ট ওকে পাত্তা দেয় না। কালী নিজের সঙ্গে বকবক করে।

কর্নেল বললেন, আগে আপনার দত্তক পুত্রের কথা বলুন। তারপর অন্য কথা।

রানীমা আস্তে বললেন, কালীর কাছে কী শুনেছেন জানি না। তবে--

কর্নেল দ্রুত বললেন, প্রথমে শুনেছি ভটচাযমশাইয়ের কাছে।

রানীমা একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, আমার ডিসিশনে ভুল হয়েছিল। বাচ্চুর জন্যই আমি বিপন্ন।

বিপদটা কী?

আপনি এ বাড়ির পাতালঘর দেখেছিলেন। সেই ঘরে একটা সিন্দুক আছে।

হ্যাঁ। কুমার বাহাদুর আমাকে দেখিয়েছিলেন। সিন্দুকের তালা দুটো চাবি ছাড়া খোলা যায় না।

আমি একটা চাবি বাচ্চুকে দিয়ে রেখেছিলুম। কারণ আমার বয়স হয়েছে। হঠাৎ মৃত্যু হলেই হল। বাচ্চু নিখোঁজ হওয়ার পর ওর ঘর তন্ন তন্ন খুঁজে সেই চাবিটা পাইনি। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চাবিটা বাচ্চু সব সময় তার কাছে রাখত। যদি কেউ তাকে খুন করে থাকে, তা হলে চাবিটার লোভেই করেছে। এবার আপনাকে তিনটে চিঠি দেখাচ্ছি। গত তিন সপ্তাহে গেটের ভেতর কুড়িয়ে পেয়ে কালী আমাকে দিয়েছে। কালী চিঠিগুলো পড়েছে। কারণ ভাঁজকরা খোলা চিঠি।

পেটের কাছে কাপড়ের ভেতর থেকে রানীমা একটা খুদে হ্যান্ড ব্যাগ বের করলেন। হ্যান্ড ব্যাগটা চেন দিয়ে কোমরের সঙ্গে আটকানো আছে দেখলুম। সেটা খুলে কর্নেলকে তিনি ভাঁজকরা তিনটে চিঠি দিলেন। চিঠিগুলো ছোট্ট। কর্নেলের পাশে বসেছিলুম বলে আমারও পড়া হয়ে গেল। তিনটে চিঠিতে একই কথা লাল ডটপেনে লেখা আছে।

'রানীমা

দু'নম্বর চাবিটা চাই। মন্দিরের পেছনে চৌকো লাল পাথরের ওপর রেখে দিলে আমরা পাব। চাবি না পেলে প্রাণ যাবে। পুলিসকে জানিয়ে লাভ হবে না।'

কর্নেল বললেন, ভটচাযমশাইয়ের কাছে শুনেছি, এলাকার পুলিসের ডি আই জি আপনার আত্মীয়। তাঁকে চিঠিগুলো কি দেখিয়েছেন?

অরবিন্দের ওপর আমার ভরসা নেই। তাই ওকে জানাইনি।

কালীপদ জানিয়ে থাকতে পারে!

রানীমা শক্ত মুখে বললেন, জানিয়েছিল। অরবিন্দের কাছে আমি কথাটা গুজব বলে অস্বীকার করেছি।

কর্নেল চিঠিগুলোর তাসের মতো ধরে বললেন, অরবিন্দবাবুর ওপর ভরসা না থাকার কি বিশেষ কোনও কারণ আছে?

নিশ্চয় আছে। সে তো একা কিছু করতে পারবে না। তার ডিপার্টমেন্টের লোকেদের সাহায্য নেবে। তাতে পাতালঘরের সিন্দুকের কথাটা অনেকে জেনে ফেলবে। তার চেয়ে বড় কথা, সরকারের উঁচু মহলে কথাটা পাচার হলে সরকার সিন্দুক বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। আমার স্বামী বলেছিলেন, সরকার এইসব জিনিস বাজেয়াপ্ত করার জন্য আইন করেছেন। সিন্দুকে কী আছে, তা তো আপনি দেখেছিলেন!

দেখেছিলুম। মোগল বাদশাহের ফরমান। বংশের প্রথম রাজা আদিত্যকান্তি সিংহের রাজমুকুট আর পোশাক। অনেক স্বর্ণমুদ্রাও দেখেছিলুম। সবই মোগল যুগের মোহর।

আমি বললুম, কালীপদ বা ভটচাযমশাই কি এ কথা জানেন?

রানীমা আস্তে বললেন, না। কালী জিজ্ঞেস করেছিল কিসের চাবি? আমি জবাব দিইনি।

কর্নেল বললেন, বাচ্চুকে কি সিন্দুক খুলে দেখিয়েছিলেন আপনি?

সিন্দুক খুলে দেখাইনি। তবে ওকে পাতালঘরে নামবার জায়গা এবং কী কৌশলে সেখানে নামা যায়, তা শিখিয়ে দিয়েছিলুম। আর বলেছিলুম, আমার মৃত্যু হলে দু'নম্বর চাবি আমার এই খুদে ব্যাগে থাকবে। ব্যাগটা সব সময় আমার সঙ্গে থাকে।

কর্নেল বললেন, চাবিটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরবেন না। কোথাও গোপনে রেখে দেবেন।

রানীমা দ্বিধার সঙ্গে বললেন, কিন্তু কোথায় রাখব?

এমন কোথাও রাখুন, যেখানে চাবি থাকার সম্ভাবনা কারও মাথায় আসবে না।

আপনি ঠিকই বলেছেন।

আচ্ছা মিসেস সিংহ। এই চিঠির হাতের লেখা আপনার চেনা মনে হয়েছে কি?

রানীমা কর্নেলের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টে তাকালেন। একটু পরে বললেন, না তো। কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছেন?

এমনি। বলে কর্নেল চিঠি তিনটে ভাঁজ করলেন। এগুলো আমি আপাতত রাখছি।

রাখুন। আপনার ওপর আমার আস্থা আছে। আমার স্বামী মৃত্যুর আগে বলে গেছেন, কোনও বিপদে পড়লে যেন আপনার সাহায্য নিই। আপনার কীর্তি-কলাপের কথা তাঁর মুখে তো কম শুনিনি।

এবার একটা জিনিস চাইব।

বলুন?

বাচ্চুবাবুর ঘরে নিশ্চয় তালা আঁটা আছে। সেই ঘরের চাবিটা আমার দরকার।

পাবেন। ওপরে আমি উঠতে পারি না। তাই দোতলার সব ঘরে তালা দেওয়া আছে।

রানীমা খুদে ব্যাগটা পেটের কাছে কাপড়ের ভেতর চালান করে দিয়ে বললেন, এখন আর কথা নয়। আপনারা রাত্রি জেগে এসেছেন। ব্রেকফাস্ট করে বিশ্রাম করুন।

কর্নেল হাসলেন। বিশ্রাম করব না। আপনার ক্যাকটাসের বাগানে ঢুকব।

রানীমা উঠে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললেন, আমার নয়। কালীর। কালীকে এখন বাড়ির সব কাজ করতে হয়। ওর সঙ্গে জবার বিয়ে দিয়েছি। জবার মা সুরবালা মারা গেছে। জবা আমার সব সময়ের সঙ্গিনী। ওদের একটা বাচ্চা হয়েছে। আশ্চর্য! বাচ্চাটা এত শান্ত! আমার ঘরের পাশের একটা ঘরে এখন ওরা থাকে। জবার হাতের রান্না খাই বলে হরেকেষ্ট আড়ালে ছি-ঘেন্না করে। করুক! ও তো শুচিবায়ুগ্রস্ত আকাট বামুন!

কর্নেল তাঁর প্রসিদ্ধ অট্টহাসি হেসে বললেন, অসাধারণ বলেছেন! আকাট বামুন।

হ্যাঁ। যাকে বলে আষ্টেপিষ্টে সাত্ত্বিক বামুন। মাঝে মাঝে আমাকে শুনিয়ে বলে, সন্ন্যাস-ধর্ম নিয়ে হিমালয়ে চলে যাব। আমি বলি, ওরে হরেকেষ্ট! তুই তো এমনিতেই সন্ন্যাসী! হিমালয়ে চড়ে ঠ্যাং ভাঙবি কেন? মা সিংহবাহিনীর পায়ের তলায় পড়ে থাক গে। তাতেই তোর মোক্ষ ঠেকায় কে?

রানীমা মোটা ছড়িটা মুঠোয় ধরে চলে গেলেন। কর্নেল পশ্চিমের জানালায় বাইনোকুলারে কিছু দেখতে থাকলেন। আমি বললুম, ভদ্রমহিলার অসাধারণ মনোবল! সত্যি কর্নেল! আপনার সঙ্গী হয়ে এ যাবৎ অনেক রানীমা বা মহারানীও দেখেছি। কিন্তু এই বয়সে এমন ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা বিরল।

কর্নেল বললেন, আমিও একটা বিরল প্রজাতির সারস দেখতে পাচ্ছি জয়ন্ত। কী অদ্ভুত! টমসায়েবের বাংলোর উত্তরে সরকারবাহাদুর একটা ওয়াটার ড্যাম তৈরি করে ফেলেছেন দেখছি।

ক্যাকটাস ফেলে সারসের পেছনে দৌড়বেন নাকি?

দেখা যাক। মাই গুডনেস!

কী ব্যাপার?

নলপাহাড়ি টিলার মাথায় অশ্বত্থ গাছের ডালে একটা সেক্রেটারি বার্ড!

কালীপদ এসে বলল, রানীমা আপনাদের ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট খেতে ডাকলেন স্যার!

কর্নেল বাইনোকুলার রেখে বললেন, কালীপদ! একিনোক্যাকটাস—মানে তুমি যেটাকে কুমড়োপটাশ বলতে, সেটার বংশ রক্ষা করেছ তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কুমড়োপটাশ বলতেন আসলে রাজবাড়ির দেওয়ানজি। তাঁর মুখে শুনে-- তবে স্যার, হাইব্রিডিংয়ের শিক্ষা কুমার বাহাদুরের হাতে। আমি ক্যাকটির কয়েকটা জোড়কলম করেছি। আপনাকে দেখাব। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস

করতে পারি না স্যার!

কথা বলতে বলতে কালীপদ আমাদের একটা বড় হলঘরের ভিতর নিয়ে গেল। ঘরটা নানারকম স্টাফকরা বুনো জন্তু দিয়ে সাজানো। ভেতর থেকে দোতলায় জীর্ণ বিবর্ণ কার্পেটে মোড়া কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে। তারপর দুটো ঘর পেরিয়ে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে ডাইনিং রুম। সেকেলে আসবাবে সাজানো। বিশাল ডাইনিং টেবিলের ওপর সাজানো খাদ্যের প্লেট। রানীমা দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, কর্নেলের যোগ্য ব্রেকফাস্ট হল না। দিশি খাদ্যই খেতে হবে। লুচি, আলুর দম, সন্দেশ। অবশ্য এগপোচ আছে। এ বেলা একটু কষ্ট করে খান।

কর্নেল বললেন, কষ্ট কিসের?-আমি তো আর বিলিতি সায়েব নই। ডালভাত পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

কুমার বাহাদুর বেঁচে থাকতে বাড়িতে গেস্ট এলে বাবুর্চি নিয়ে আসতেন। আপনার মনে পড়বে। টমসায়েবের এক ভাই ছিল চিত্তরঞ্জনে। মরিসসায়েব।

হ্যাঁ। ভদ্রলোক দুর্দান্ত শিকারি ছিলেন।

মরিসসায়েব এলে সঙ্গে মুসলমান বাবুর্চি আনতেন। তার জন্য আলাদা কিচেন তৈরি করা হত বটতলায়। আপনাকে লুকোব না। গোপনে তার রান্নাকরা খাবার খেয়েছিলুম।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। কুমার বাহাদুর বলেছিলেন আমাকে। আপনি নাকি—

রানীমা হাসি চেপে দ্রুত বললেন, নাকি আবার কী? বললুম তো!

মরিসসায়েব কি বেঁচে আছেন?

না। অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। কী সব দিন ছিল তখন!

টমসায়েবও তো মারা গেছেন?

হ্যাঁ। ওর ছেলে জন চিত্তরঞ্জনে চাকরি করে।

টমসায়েবের একটি মেয়ে ছিল মনে পড়ছে?

লক্ষ্য করলুম রানীমার মুখ নিমেষে গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন, বাবা জয়ন্ত। তুমি কিন্তু কিছু খাচ্ছ না! লজ্জা কোরো না।

বললুম, না না। আমি অনেক বেশি করে খাচ্ছি।

কর্নেল প্রশ্নটা চেপে গেলেন। খাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে কালীপদর ক্যাকটাস পরিচর্যা দেখতে গেলুম। সে ক্যাকটাসের কয়েকটা জোড়কলম দেখিয়ে দিয়ে রানীমার তাড়ায় সাইকেলে চেপে বাজার চলে গেল। এতক্ষণে বাড়ির চৌহদ্দি খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেলুম। বাড়ির পূর্ব ও দক্ষিণের বাউন্ডারি ওয়াল উঁচু। কিন্তু জরাজীর্ণ অবস্থা। জায়গায়-জায়গায় ফাটলের মধ্যে কাঠের বেড়া আছে। পশ্চিমের পাঁচিল কবে ধসে গেছে বলে কাঠের বেড়া দেওয়া আছে। ওদিক দিয়েই আমরা রাজবাড়িতে ঢুকেছিলুম।

কর্নেল ক্যাকটাসগুলো দেখতে দেখতে কী সব নাম উচ্চারণ করছিলেন। এক সময় তিনি বললেন, এপ্রিলের শেষাশেষি এগুলোর ফুলের কুঁড়ি দেখা দেবে। গ্রীষ্মে তো রঙবেরঙের ফুলের আগুন জ্বলে উঠবে। তখন যদি আসবার সুযোগ পাই, ছবি তুলে নিয়ে যাব। চলো! এবার মন্দিরের দিকটা দেখে আসি।

মন্দিরটা বিশাল। কিন্তু এদিকে কোনও দরজা নেই। মন্দিরের পাশে পুবের পাঁচিলে একটা দরজা দেখলুম। কর্নেল দরজার হুড়কো খুলে বললেন, পুকুরটার অবস্থা শোচনীয় দেখছি। আর পদ্মফুলও ফোটে না।

জিজ্ঞেস করলুম, মন্দিরের দরজা কোনদিকে?

কর্নেল পুকুরপাড়ে গিয়ে বললেন, মন্দিরটা এক সময় ছিল পাঁচিলঘেরা। উত্তরের ওই যে জমিটা দেখছ, ওখানে মেলা বসে। দরজা পরে দেখাচ্ছি। আগে সেই চৌকো লাল পাথরটা খুঁজে দেখি, যেখানে সিন্দুকের দু'নম্বর চাবি রাখতে বলা হয়েছে।

একটু পরেই মন্দিরের পেছনে পুকুরপাড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে অনেক পাথরের চাঙড় দেখতে পেলুম। তারপর লাল পাথরটা চোখে পড়ল। কর্নেল বললেন, উপযুক্ত জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে। এখানে চাবি রাখলে সেই চাবি হাতিয়ে নিয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতর গা ঢাকা দেওয়ার সুযোগ আছে।

বলে তিনি বাইনোকুলারে এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখে নিলেন। তারপর আবার রাজবাড়িতে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। রাজবাড়ির দোতলা দালান এবং মন্দিরের মধ্যে প্রায় দশ মিটার চওড়া জায়গা। পুরোটা পাথরের ইটে বাঁধানো। কয়েক পা এগিয়ে ডানদিকে মন্দিরের দরজা দেখা গেল। দরজায় তালা আঁটা। উল্টোদিকে অর্থাৎ পশ্চিমে দালানের বারান্দা। দু'দিকে দুটো প্রকাণ্ড থাম। এই অংশটা একতলা। একটা তালাআঁটা ঘর দেখিয়ে কর্নেল বললেন, এই ঘরটায় ভটচাযমশাই থাকেন।

পাথরের ইটে বাঁধানো চত্বরের উত্তরে পাঁচিলটা মেরামত করা হয়েছে। সেখানে একটা প্রকাণ্ড দরজা এবং সেই দরজার কপাট লোহার। লাল রঙ করা হয়েছে কপাটে। কর্নেল বললেন, পুজোর সময় ওটা খোলা থাকে। মেলার লোকেরা দেবীকে দর্শন করতে আসে।

পাথুরে চত্বরে একটা সিঁদুর-মাখানো হাড়িকাঠ দেখে বললুম, পাঁঠাবলির ব্যবস্থা দেখছি!

কর্নেল হঠাৎ বারান্দায় উঠে গিয়ে ভটচাযমশাইয়ের ঘরের তালাটা আতস কাচ দিয়ে দেখতে থাকলেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন, তুমি একটু লক্ষ রাখো জয়ন্ত! রানীমা এসে পড়তে পারেন।

হতবাক হয়ে দেখলুম, কর্নেল পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে তালাটা খোলার চেষ্টা করছেন। তালাটা সাধারণ। একটু চেষ্টার পর খুলে গেল। উনি সটান

ঘরে ঢুকে গেলেন। যেটুকু চোখে পড়ল, ঘরে একটা খাটিয়ায় বিছানা গুটানো আছে। কর্নেলের ইশারায় সরে আসতে হল।

কিছুক্ষণ পরে দেখি, রানীমা দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসছেন। অমনি চাপা স্বরে ডাকলুম, কর্নেল! রানীমা!

অমনি কর্নেল বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করলেন। তালাটা আগের মতো এঁটে দিয়ে চত্বরে নেমে এলেন। গলা চড়িয়ে বললেন, রাঢ় অঞ্চলে শাক্তদেরই প্রাধান্য। এক সময় নাকি মোষবলি হত। এখন পাঁঠাবলি হয়। আগে রাজবাড়িরই কেনা ১০৮টা পাঁঠাবলি হত। আজকাল কতগুলো বলি হয় জানি না। চত্বরটা রক্তে ভেসে যেত।

রানীমা এসে বললেন, বলিদান বন্ধ হয়নি কর্নেলসায়েব! মেলা কমিটি রাজবাড়ির প্রথা বন্ধ করেনি। তবে আমি রক্ত দেখতে পারি না। ছাদে বসে মেলা দেখি। শুধু সন্ধিপুজোর দিন মন্দিরের বারান্দায় উপস্থিত থাকতে হয়। এই চত্বরটা পেরুনোর সময় চোখ বুজে থাকি। কেউ আমার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে যায়। আপনারা দেবী দর্শন করতে চাইলে মন্দিরের তালা খুলে দেব।

কর্নেল বললেন, এখন থাক। আমি মন্দিরের পেছনে সেই চৌকো লাল পাথরটা দেখে এলুম।

রানীমা বললেন, আমিও দেখেছি।

আপনার পক্ষে আর ওখানে না যাওয়াই ভাল। এতদিন খুব রিস্ক নিয়ে ঘুরেছেন।

রানীমা হাসলেন। বজ্জাতরা জানে, রাজবাড়ি থেকে বেরলে আমার হাতে কী থাকে!

ফায়ার আর্মস?

রানীমার মুখে দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠল। বললেন, আমার স্বামীর রিভলভারটা আমার নামে লাইসেন্স করিয়ে নিয়েছি। অরবিন্দই কাজটা করে দিয়েছিল। তখন সে ছিল এস পি। আর আপনি জানেন, আমার স্বামী এক সময় আমাকে রাইফেল চালানো শিখিয়েছিলেন। চল্লিশ বছর আগের কথা। রাইফেল আর নেই। কিন্তু এ বয়সেও আমার হাতের টিপ ঠিকই আছে। সাধে কি বজ্জাতগুলো শুধু চিঠি দিয়েই চুপ করে আছে? তারা জানে, সামনে এলেই কী হবে।...

।। চার ।।

একটু পরে বুঝতে পারলুম, রানীমা এসেছিলেন দোতলায় বাচ্চুর ঘরের চাবি দিতে। চাবিটা দিয়ে তিনি চলে গেলেন। তখন বললম. ভটচাযমশাইয়ের ঘরে গোয়েন্দাগিরির কারণ কী?

কর্নেল বললেন, নিছক কৌতূহল।

বললুম, দুঃখিত বস্! বিশ্বাস করতে পারছি না!

কর্নেল হাসলেন। তুমি বস্ বলাটা ছাড়ো তো! লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ লাহিড়ির দেখাদেখি এই বদ অভ্যাসটা তুমি রপ্ত করেছ। অরিজিতের বলার মধ্যে একটা মজা থাকে। জয়ন্ত। তুমি ওই টোনে শব্দটা উচ্চারণ করতে পারো না! আগে ওর কাছে ট্রেনিং নিও।

নেব খন। কিন্তু ভটচাযমশাইয়ের মতো—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন, আকাট বামুনের ঘরে ঢুকে আকাট মুর্খ বনে গেছি জয়ন্ত। আমার বোঝা উচিত ছিল, সাত্ত্বিক হলেও ঘোর শাক্ত উনি। তাই খাটিয়ার তলায় কারণবারির বোতল থাকতেই পারে।

অবাক হয়ে বললুম, উনি মদ খান?

কারণবারি বলো! তবে এতে দোষ নেই। শাস্ত্রে দেবতাকে উৎসর্গ করা কারণবারি পান বৈধ। ভেবে দেখ, নিঃসঙ্গ জীবনে একটু-আধটু রসকষ ছাড়া শান্তি মেলে না।

ওটা ছাড়া আর কিছু দেখলেন কি না বলুন?

একটা ধারালো খাঁড়া দেখলুম। এমন পরিবেশে ওটা আত্মরক্ষার কাজে লাগবে। অবশ্য ওই খাঁড়া দিয়ে রাজবাড়ির পক্ষ থেকে পাঁঠাবলি হয় সম্ভবত রীতিমতো ঐতিহ্যশালী একটা খড়্গ।

বলে কর্নেল বারান্দার নীচের লনে হাঁটতে থাকলেন। তারপর হঠাৎ থেমে গুঁড়ি মেরে মৃত এবং ভেঙেপড়া ফোয়ারার পাশে গিয়ে ক্যামেরা বার করলেন। ওখানে মরসুমি ফুলের সমারোহ। ক্যামেরার শাটার টিপে উনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কনিষ্ক কানাসে' প্রজাপতি। পাঁচ সেন্টিমিটার ডানার দৈর্ঘ্য। এর বৈশিষ্ট্য ঘন নীল রঙের তলায় ফিকে নীল কারুকাজ। সাধারণ নেটিভ প্রজাতি হলেও সৌন্দর্য অসামান্য। এদের ধরা কিন্তু সহজ নয়।

বেগতিক দেখে বললুম, আমি ডাম টায়ার্ড। ঘুম পাচ্ছে।

চলো। এবার দোতলায় বাচ্চুবাবুর ঘরটা দেখা যাক।

হলঘরের দরজা খোলা ছিল। লক্ষ্য করলুম, এক সময় এখানে পোর্টিকো ছিল। পুরোটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার বারান্দায় গেলুম। উঁচু

থেকে দক্ষিণে ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গলের ওধারে বিজয়গড় গ্রামের ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছিল। অলকেন্দু ওরফে বাচ্চুর ঘরের তালা খুলে কর্নেল বললেন, জানালাগুলো খুলে দাও জয়ন্ত!

জানালাগুলো খুলে ঘরটা দেখে অবাক হলুম। মেঝেয় লাল কার্পেট। সুদৃশ্য বেডকভারে ঢাকা নিচু খাট। দেওয়ালে প্রায় নগ্ন ফিল্ম হিরোইনদের কাট-আউট। একটা টি ভি। টেপ রেকর্ড বাজানোর বৃহৎ ডেক। দু'ধারে মাইক্রোফোন বক্স। কাচের আলমারিতে কতরকমের পুতুল মেমসায়েব আর নগ্ন নারীমূর্তির ভাস্কর্য। টেবিলের ওপর সাজানো রঙিন ইংরেজি পত্রিকা। 'প্লে বয়' নামক কুখ্যাত বা বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকাও আছে। দেওয়ালে সেলার। কাচের ভেতর সাজানো হুইস্কি রাম জিন আর ওয়াইনের বোতল। বললুম, রানীমা এগুলো ফেলে দেননি এটাই আশ্চর্য!

কর্নেল দেওয়ালে একটা ছবি দেখছিলেন। বললেন, এটাই বাচ্চুবাবুর ছবি। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বোকাসোকা। কিন্তু দেখতে সুন্দর।

বললুম, ফিল্মের হিরোদের মতো বোকা-বোকা চেহারা!

হিরোরা বোকা নয়, জয়ন্ত! ওটা তোমার ঈর্ষা।

ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে দেখেই বিব্রত বোধ করলুম। অলকেন্দু সত্যি সুন্দর। কিন্তু ড্রেসিং টেবিলে মেয়েদের মতো অত প্রসাধন সামগ্রী কেন? কতরকমের এসেন্সের ছোট-বড় বোতল। কর্নেল চারদিকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে কখনও হাঁটু ভাঁজ, কখনও অর্ধবক্র শরীর, কখনও জুতোর জগায় ভর করে আলমারির ওপরটা দেখতে ব্যস্ত। একটু পরে তিনি বললেন, এই ঘরের চাবি বাচ্চু রানীমাকে দিয়ে যায়নি। এটা ডুপ্লিকেট চাবি। অথবা রানীমা নিজেই এ ঘরের তালা ভেঙে নতুন তালা এঁটেছেন। কারণ ঘরের ভেতর আলমারি, ওয়ার্ডব আর সেলারের চাবি, এই চাবির সঙ্গে থাকা উচিত ছিল। এক মিনিট! শুধু সেলারটা দেখার কৌতূহল হচ্ছে।

কর্নেল তাঁর পকেট থেকে সেই চাবির গোছা বের করলেন। কোনও চাবি কাজে লাগল না। তখন তিনি জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে স্ক্রুড্রাইভারের মতো দেখতে একটা সুচালো জিনিস বের করলেন। এতক্ষণে বুঝতে পারলুম তিনি তৈরি হয়েই নীচের ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন।

সেলারের তালাটা হয়তো ভেঙে গেল। তালাটা কাঠের ফ্রেমে বসানো ছিল। কাচের পাল্লা খুলে কর্নেল প্রথমে নীচের থাকে মদের বোতলগুলোর পেছনে হাত দিলেন। তারপর দ্বিতীয় থাকে। শেষে তৃতীয় থাকের পেছন থেকে একটা ছোট অ্যালবাম বেরিয়ে এল। অ্যালবাম খুলেই কর্নেল বললেন, বাহ্! বাচ্চুর ভ্রমণের ছবি। বন্ধু-বান্ধবসহ পাহাড়-জঙ্গল-সমুদ্র তীরে তোলা ছবি। সঙ্গিনীও আছে। দিশি তরুণী। প্রেমিকা তো বটেই।

তারপর একটা পাতা খুলে তিনি বললেন, জয়ন্ত! সম্ভবত আইভির ছবি এটা।

উঁকি মেরে দেখলুম, এক তরুণী মেমসায়েবের কাঁধে হাত রেখে বাচ্চু দাঁড়িয়ে আছে।

পরের পাতায় পাওয়া গেল মেমসায়েবের পোর্ট্রেট। কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। আইভির বটে। ছবির ওপর সই করা আছে আই জে নিউসন। অক্টোবরের তারিখ। এই ছবিটা চুরি করলুম। বলে তিনি ছবিটা বের করে নিলেন সাদা সেলোফেনের স্বচ্ছ মোড়ক থেকে। কয়েকটা পাতার পর বাচ্চুর একটা ছবি পাওয়া গেল। সেটাও তিনি বের করে নিলেন। তারপর অ্যালবামটা সেলারে যথাস্থানে রেখে পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলেন।

বললুম, আট বছর আগে আপনি তো এই ঘরে ছিলেন। তখন কি সেলার ছিল?

নাহ্। এসব আসবাব নতুন। তখন ছিল সেকেলে আসবাব। প্রকাণ্ড এবং উঁচু পালঙ্ক ছিল। এবার বাথরুমটা দেখা যাক।

বাথরুমের দরজায় তালা আঁটা নেই। কর্নেল উঁকি মেরে দেখে বললেন, নাহ্। বাথটাব। শাওয়ার। গিজার। মর্ডার্ন গ্যাজেটে সাজানো।

বললুম, বাচ্চুবাবু না বলে বাচ্চুসায়েব বলা উচিত। আগাপাশতলা মড্।

হ্যাঁ। আমাদের দেশের নিউ জেনারেশনের একটা অংশ যে-কালচারে আক্রান্ত, তার নমুনা তা হলে 'যক্ষপুরী'-তেও পাওয়া গেল। বলে কর্নেল বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তারপর উত্তরের জানালায় গিয়ে বাইনোকুলারে সম্ভবত বিরল প্রজাতির সারস ও সেই কানে কলমগোঁজা কেরানি পাখি বা 'সেক্রেটারি বার্ড' দেখতে থাকলেন। উত্তরের ঠাণ্ডা হিম হাওয়া ঘরের ভেতর নেচে বেড়াচ্ছিল। খাটের পাশে নিচু টেবিলে রাখা দিশি-বিদেশি পত্রিকাগুলোর মতো উড়ছিল। হঠাৎ একটা পত্রিকার ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ উড়ে খাটের ওপর পড়ল। পশ্চিমের জানালা গলিয়ে পালানোর আগেই সেটা ধরে ফেললুম। তারপর বললুম, কর্নেল! একটা চিঠি। ম্যাগাজিনের ভেতর থেকে উড়ে যাচ্ছিল।

কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে উত্তরমুখী হয়ে থেকেই বললেন, পড়ো! শুনতে পাব।

পড়লুম :

'প্লিজ মিট মি নিয়ার দা বাংলো টু নাইট অ্যাট টেন ও' ক্লক।

দিস ইজ আর্জেন্ট। আই জে এন'

কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে বলল, আইভি সবুজ কালি পছন্দ করে। একই সিগনেচারপেনে লেখা।

বললুম, রানীমা তন্ন তন্ন খুঁজেছিলেন বলছিলেন—

উনি খুঁজেছিলেন সিন্দুকের চাবি। কোনও চিঠি খোঁজেননি।

আপনিও খোঁজেননি। দৈবাৎ এটা পাওয়া গেল।

কর্নেল হাসলেন। আমি একটা থিয়োরি দাঁড় করিয়ে প্রমাণ খুঁজে বেড়াই। ডিডাকটিভ মেথড। এর উল্টো ইনডাকটিভ মেথড ধরে এগোলে খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার ব্যাপার হবে। আমার থিয়োরি হঠাৎ পাওয়া কোনও তথ্য নড়বড়ে করে দেয়। তখন অন্য থিয়োরি দাঁড় করাই অথবা আগের থিয়োরি বদলে ফেলি। যাই হোক, চিঠিটা আমার থিয়োরিকে দুর্বল করে দিল।

থিয়োরিটা কী ছিল?

কর্নেল মুখে হাসি রেখে বললেন, এখন থিয়োরি নিয়ে বকবক করার চেয়ে স্নান সেরে নেওয়া স্বাস্থ্যকর।

বলে তিনি জানালা বন্ধ করতে থাকলেন। আমিও জানালা বন্ধ করতে ব্যস্ত হলুম। তারপর বললুম, পত্রিকাগুলোর পাতা খুঁজলে আরও কিছু বেরতে পারে।

হয়তো পারে। তবে কথাটা কি জানো? ওইসব গা ঘিন ঘিন করা অশ্লীল পত্রিকার পাতা ওল্টানোর ইচ্ছা আমার ছিল না। হ্যাঁ, আমিও কিছু কিছু ব্যাপারে ভটচাযমশাইয়ের মতো শুচিবায়ুগ্রস্ত।

আপনি প্রখ্যাত রহস্যভেদী। রহস্যভেদের স্বার্থে নোংরা ঘাঁটতে হতেই পারে।

কর্নেল দরজায় তালা এঁটে বললেন, ডার্লিং! তুমি আমাকে আজ বড্ড বাগে পেয়ে গেছ। আসলে আমার ইচ্ছে ছিল না তোমার মতো যুবকের সামনে এ ধরনের অপকর্ম করি। তোমার মনে আছে কি? কলকাতার হেস্টিংস এলাকার ক্রিকটন রোডে টয় পিস্তলের নলের ভেতর পাওয়া সেক্স-ফিল্মের প্রিন্টগুলো তোমাকে দেখাইনি। ফিল্ম স্টার চিত্রা দত্তেরও সম্মান রক্ষা করেছিলুম। *

চুপচাপ ওঁকে অনুসরণ করলুম। বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলুম ফুলবাগানের ধারে একটা ঢাকা ইঁদারার পাশে একটা গুমটিঘরের মতো ঘর। দরজা খুলে কালীপদর বউ জবা দাঁড়িয়ে আছে এবং ঘরটার ভেতর পাম্পিং মেসিন চলছে।

বললুম, আমি ভেবেছিলুম বিজয়গড় থেকে জলের লাইন আনা হয়েছে রাজবাড়িতে।

কর্নেল বললেন, ফোয়ারটা দেখেও বুঝতে পারোনি বাড়িতেই জলের ব্যবস্থা আছে?

ফোয়ারাটার অমন অবস্থা কেন? মেরামত করে চালু করলে সুন্দর দেখাত।

* লেখকের 'কবরের অন্ধকারে' উপন্যাস দ্রষ্টব্য।

ব্যাকগ্রাউন্ডে ফুলের বাগান।

ভটচাযমশাই বলছিলেন না আর সে-রাজত্ব নেই? ফোয়ারা চালু রাখার অনেক ঝক্কি।

কথা বলতে বলতে আমরা হলঘরে নেমে এলুম। কর্নেল স্টাফকরা একটা বাঘের পেছনে বিশাল পেন্টিং দেখিয়ে বললেন, ওই ছবিটা রাজা আদিত্যকান্তি সিংহের। ছবিটা আঠারো শতকে একজন ডেনিশ চিত্রকর এঁকেছিলেন। ওই দেখ, পড়া যাচ্ছে তারিখটা। এইটিন্থ মার্চ, ১৭১২ এ ডি। পলাশীর যুদ্ধের পঁয়তাল্লিশ বছর আগে আঁকা। কুমার বাহাদুরের একটা সংগ্রহশালা দেখেছিলুম। প্রচুর পুরনো পেন্টিং আর ভাস্কর্য ছিল। জানি না সেগুলো রানীমা কোথাও দান করেছেন কি না।

আমরা ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণ পরে কালীপদ এসে বলল, জল গরম করা হচ্ছে। স্যারেরা স্নান করে নেবেন।

কর্নেল বললেন, আচ্ছা কালীপদ, রাজবাড়ির একটা ঘরে অনেক ছবি আর মূর্তি ছিল। সেগুলো এখনও আছে?

কালীপদ বলল, কিছু কিছু আছে স্যার!

বাকিগুলো কোথায় গেল?

কালীপদ চাপা স্বরে বলল, কী আর বলব স্যার? বাচ্চুবাবুর গুণের কথা বললে শেষ হবে না। একটা-দুটো করে কোথায় নিয়ে যেতেন। আমাকে শাসাতেন। তাঁর বন্ধুরা সব বিজয়গড়ের গুণ্ডা-মস্তান। অথচ সবাই ভদ্রলোকের ছেলে। দিনকাল কী হয়েছে ভাবুন!

রানীমা তো টের পেতেন?

প্রথমে পাননি। যখন পেলেন, তখন অর্ধেক নিপাত্তা হয়ে গেছে। ডবল তালা এঁটে রেখেছেন।

রানীমার ডাক শোনা গেল, কালী! ও কালী!

কালীপদ চলে গেল।...

কর্নেল ঝটপট ছবি দুটো, চিঠিটা এবং তাঁর গোপনে তালা খোলার চাবিগুলো কিটব্যাগে ভরে রাখলেন। জ্যাকেটের ভেতর থেকে স্ক্রু-ড্রাইভার জাতীয় জিনিসটাও ঢোকালেন। বললুম, আপনি দেখছি রীতিমতো সেগেজুজেই বেরিয়েছেন। কিন্তু আপনি কি জানতেন গোপনে কোনও তালা খুলতে হবে?

এ কোনও নতুন ব্যাপার নয় জয়ন্ত! আমার কিটব্যাগে অনেক কিছু থাকে। সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা। কাঁটাতারের বেড়া কাটার অস্ত্র থেকে শুরু করে প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে আঙুলের ছাপ নেওয়ার সরঞ্জাম-- কী নেই? পেরেক, গোঁজ,

হাতুড়ি, এমন কি ফার্স্ট এডের খুদে বাক্স। যাই হোক, নিয়ম ভঙ্গ করে আজ আমি স্নান করব।

কর্নেল শীতকালে সপ্তাহে একদিন স্নান করেন। বাকি সময় তিনদিন অন্তর একদিন। অনেক সময় পনেরো-কুড়িদিন স্নান না করেও দিব্যি বহাল তবিয়তে থাকতে পারেন। আবার কী? সামরিক জীবনের অভ্যাস।...

সাড়ে বারোটায় রানীমার পরিচর্যায় খাওয়া-দাওয়ার পর অভ্যাসমতো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। কর্নেল বারান্দায় রোদে বসে চুরুট টানতে থাকলেন। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। সেই ঘুম ভাঙল কালীপদর ডাকে।

সে চা এনেছিল। কম্বল থেকে বেরিয়ে বললুম, কর্নেল কোথায়?

কালীপদ বলল, ড্যামের জলে হাঁস দেখতে গেছেন। এদিকে এক কাণ্ড!

কী কাণ্ড?

ঠাকুরমশাই এসেছেন কিছুক্ষণ আগে। এসেই দেখেন ওঁর ঘরের তালায় চাবি ঢুকছে না।

ঠাকুরমশাই মানে ভটচাযমশাই?

আজ্ঞে। কালীপদ হাসল। খামোকা হইচই বাধালেন। ঘরে কিছু চুরি যায়নি।

উনি কোথায় এখন?

রানীমার সঙ্গে কথা বলছেন। ঝোড়ো কাক হয়ে ফিরেছেন। আসানসোলে বোনের বাড়িতে ছিলেন। হাবভাব দেখে মনে হল বোনের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে। রানীমা খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছেন। খুলে কিছু বলছেন না।

হাসতে হাসতে কালীপদ চলে গেল। চারটে বাজে। শীতের দিনের আলোর রং এখানে একেবারে ফিকে লাল। চা খেয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে বারান্দায় গেলুম। দেখলুম, ভটচাযমশাই সেই মার্কামারা ফতুয়া গায়ে বারান্দার সিঁড়িতে বসে আছেন। থামের গায়ে হেলান দিয়ে রানীমা তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। একটু পরে রানীমা ঘরে ঢুকলেন। তখন ভটচাযমশাই নীচে নেমে আমার দিকে ঘুরলেন। তারপর গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে বললেন, নমস্কার জয়ন্তবাবু! আপনারা এসে গেছেন দেখছি।

নমস্কার করে বললুম, কালীপদ বলছিল আপনার ঘরে নাকি চোর ঢুকেছিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু রানীমা বিশ্বাস করছেন না।

কিছু চুরি গেছে নাকি?

চুরি কী যাবে? আছেটাই বা কী? একটা স্যুটকেসে খানকতক জামাকাপড়। কয়েকখানা তৈজস দ্রব্য। আর একটা কেরোসিন কুকার। ব্যস!

তা হলে চোর ঢুকল কেন?

ভটচাযমশাই তুম্বো মুখে বললেন, বুঝতে পারছি না। তালায় চাবি ঢোকতে গিয়ে দেখলুম ঢুকছে না। জোরে নাড়া দিলুম। তখন খুলে গেল।

এমন হতে পারে চোর ভেবেছিল কিছু দামি জিনিস পাবে!

হ্যাঁঃ। বলে হরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য গেটের দিকে তাকালেন। এবার মুখে হাসি ফুটল। কর্নেলসায়েব আসছেন। ওঁর যা স্বভাব। পাখি প্রজাপতির পেছনে ছুটোছুটি করে বেড়ানো।

কর্নেল ভেতরে এসে বললেন, আরে! এই তো আপনি এসে গেছেন! আপনার জন্য খুব ভাবছিলুম। রানীমা অবশ্য বলছিলেন, আসানসোলে বোনের বাড়ি হয়ে আসবেন। তা আপনার চেহারা অমন হয়ে গেছে কেন? অসুখ-বিসুখ হয়নি তো?

ভটচাযমশাই বললেন, না। দু' দুবার ট্রেন জার্নি। বোনের বাড়িতে অশান্তি। জামাইবাবু লোকটা হাড়বজ্জাত। এত সাহস? আমার সামনে আমার বোনকে-- যাক গে ওসব কথা। আপনি ঠিক ধরেছেন। হঠাৎ আমাশা হয়ে একেবারে দুর্বল করে ফেলেছে। গৌরাঙ্গডিহিতে এক কবরেজ আছেন। তাঁর ওষুধ খেতে খেতে এলুম। আমি তো বিলিতি ওষুধ খাই না জানেন!

আমি বললুম, ওঁর ঘরে তালা ভেঙে নাকি চোর ঢুকেছিল!

কর্নেল বললেন, সর্বনাশ!

ভটচাযমশাই বললেন, না না। কিছু চুরি যায়নি।

আপনি গায়ে চাদর জড়ান শিগগির। শীত করছে না?

হরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বাঁকা হেসে বললেন, আমার গায়ের চামড়া মোটা। মায়ের ইচ্ছায় শীত-গ্রীষ্ম আমার কাছে এক।

বলে তিনি হঠাৎ পেট চেপে ধরে হন হন করে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বললুম, সারসের ছবি তুলতে পেরেছেন?

কর্নেল বললেন, নাহ্। বেজায় ধূর্ত। সেক্রেটারি বার্ডের ছবি তুলতে গিয়ে দেখি বাংলোয় জনসায়েব সপরিবার এসেছে গাড়ি নিয়ে। আমাকে চিনতে পেরে কথা বলল।

আইভির কথা জিজ্ঞেস করেননি?

হুঁ। জন একটু খাপ্পা হয়ে বলল, আইভি চিত্তরঞ্জনে একটা স্কাউন্ড্রেলকে বিয়ে করেছে। তার নাম জেম্স্ বিশ্বাস। জনের কথায় 'নেটিভ স্কাউন্ড্রেল'। জনের সঙ্গে আর বোনের কোনও সম্পর্ক নেই। বলে কর্নেল বারান্দায় উঠে এলেন। চাপা স্বরে ফের বললেন, জেম্স্ বিশ্বাসের মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে। কথায়-কথায় জেনে নিলুম। আমার প্রথম থিয়োরি এবার পুরো ধসে পড়ল জয়ন্ত। নতুন থিয়োরি মাথায় এসেছে। ডি আই জি অরবিন্দ বোসের সঙ্গে আমার শিগগির যোগাযোগ করা

দরকার।

আমিও চাপা স্বরে বললুম, আইভি বাচ্চুকে চিঠি দিয়ে রাত্রে ডেকেছিল। তারপর-

কর্নেল বললেন, চুপ! কালীপদ! কফি না চা আনছ?

কালীপদ বারান্দায় ট্রে হাতে আসছিল। বলল, কফি স্যার! আপনি কফির ভক্ত তা কি জানি না?

।। পাঁচ ।।

কালীপদ কফির সঙ্গে গরম-গরম পকৌড়া এনেছিল। সে চলে গেলে জিজ্ঞেস করলুম, জনসায়েব কি জানে তার বোন এখন কোথায় আছে?

কর্নেল বললেন, বোনের খবর রাখে না জন। কথায় কথায় জেনে নিয়েছি, জেমস বিশ্বাস বাঙালি খ্রিস্টান। চিত্তরঞ্জনে এক কন্ট্রাক্টারের অফিসে চাকরি করত। টাকা চুরি করে পালিয়েছে।

একটু পরে সিংহবাহিনীর মন্দিরের সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে উঠল। তারপরই রাজবাড়িতে আলো জ্বলল। কালীপদ আলো জ্বালাতে জ্বালাতে বারান্দায় আমাদের কাছে এল। বারান্দার এবং আমাদের ঘরের সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়ে সে মুচকি হেসে বলল, ভটচাযমশাইয়ের নাকি আমাশা হয়েছে। আরতি দায়সারা হবে।

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, উনি না থাকার সময় পুজো-আরতি এসব কী ভাবে হত?

কালীপদ বলল, আজ হল গে শনিবার। ভটচাযমশাই কলকাতা গিয়েছিলেন বুধবার বিকেলে। এই ক'দিন সকাল-সন্ধ্যা আরতি দিতে ডেকে আনতুম পাঁচু ঠাকুরকে। আজ আসার পথে ভটচাযমশাই পাঁচু ঠাকুরকে নিষেধ করে এসেছেন।

কর্নেল তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, আচ্ছা কালীপদ, রানীমার পিসতুতো ভাইয়ের ছেলে অরবিন্দ বোস-- মানে পুলিশের ডি আই জি সায়েবকে কীভাবে খবর দেওয়া যায় বলতে পারো?

কোনও অসুবিধে নেই স্যার! বিজয়গড় থানার বড়বাবু মেজবাবু বা ছোটবাবুকে রানীমার নাম করে বললেই টেলিফোন করে দেবেন। শুধু রানীমার একখানা চিঠির দরকার।

রানীমা এখন কি মন্দিরে?

আজ্ঞে। মন্দির থেকে ফিরে এলেই বলব কথাটা।

ঠিক আছে কথাটা আমিই ওঁকে বলব। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

কালীপদ ট্রে গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল। তারপর বললুম, হালদারমশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত কর্নেল! আইভির পেছনে কে লেগেছে বা কেন লেগেছে--

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, যে-কন্ট্রাক্টারের টাকা চুরি করে জেমস্ পালিয়েছে, সে ওদের পেছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দিতেই পারে। গুণ্ডাটার ভয়েই দু'জনে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে সম্ভবত।

কিন্তু আইভি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হায়ার করবে কেন?

চুরুট ধরিয়ে কর্নেল বললেন, যত ভাববে, তত মাথা গুলিয়ে যাবে।

না কর্নেল! ব্যাপারটা গোলমেলে। আইভি পুলিসের কাছে জানাতে পারত।

ওহ্ জয়ন্ত! এটা কেন বুঝতে পারছ না, টাকা চুরি করলে সেই কন্ট্রাক্টার জেমসের নামে পুলিসের কাছে এফ আই আর করবে কি না? পুলিসও জেমসের নামে হুলিয়া জারি করবে কি না?

হুঁ। তা করবে বটে।

তাছাড়া আইভি পুলিসের কাছে যাবে কোন মুখে? তার নামেও তো হুলিয়া জারি হয়েছে! গেলেই তার স্বামী ধরা পড়ে যাবে এবং সে-ও বাচ্চুর কেসে অ্যারেস্ট হয়ে যাবে!

বলে কর্নেল ঘরে ঢুকলেন। টেবিলে কিটব্যাগ, বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা রেখে বাথরুমে গেলেন। বারান্দায় শীত করছিল। তাই ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। কর্নেলের যুক্তিগুলো মনঃপূত হল না। আইভি প্রাইভেট ডিটেকটিভের শরণাপন্ন কেন হল এই প্রশ্নটা মাথার ভেতর মাছির মতো ভনভন করতে থাকল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে কর্নেল বললেন, বসো! আসছি।

উনি চলে যাওয়ার পর পশ্চিম ও উত্তরের লম্বাটে খড়খড়িওয়ালা জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিলুম। এ ঘরে পুরনো আমলের ভারি এবং নকশাদার পর্দা। কোথাও-কোথাও একটু ফেটে আছে। তবে সহজে চোখে পড়ে না। শুধু এটাই আশ্চর্য, মশার উৎপাত নেই।

কেন নেই তা অভিজ্ঞতার সূত্রে বুঝতে পারলুম। অনেকদিন এ ঘর বন্ধ ছিল। মশারা মানুষের রক্তপানের সুযোগ না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কাল নিশ্চয় ওরা ক্রমে ক্রমে জেনে যাবে মানুষ এসেছে। তখন দলে দলে বেরিয়ে পড়বে গুপ্ত স্থান থেকে। হুঁ। খাটের সঙ্গে মশারি খাটানোর ব্যবস্থা আছে। মশারি খাটালেই ওরা সবুজ সঙ্কেত পাবে।

আরতির ঘন্টা এতক্ষণে থামল। তারপর দূরে কোথাও শেয়ালের ডাক শুনতে

গেলুম। সামনাসামনি দক্ষিণে বটগাছের দিকে হঠাৎ পেঁচা ডেকে উঠল ক্র্যাঁও! ক্র্যাঁও! তারপর চুপ করে গেল। আবার গাঢ় স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। এই বাড়িটা সত্যি যক্ষপুরী। কেন যেন অস্বস্তি হতে থাকল। ফায়ার আর্মসটা বের করে বিছানায় বালিশের তলায় রেখে দিলুম।

এই সময় মনে পড়ে গেল অলকেন্দুর কথা। সে যাই-ই হোক না কেন, এ বাড়িতে থাকার সময় বড়িটাকে সে প্রাণবন্ত করে রাখত। এমন সব রাতে তার হইচই, গান-বাজনার রেকর্ড খশুহর অধ্যুষিত এই যক্ষপুরীকে প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ রাখত না কি? হয়তো রানীমা এটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ওর প্রতি তত কঠোর হতে পারেননি। তার ঘর এখনও যে তেমনি সাজানো আছে, তা নিশ্চয় তার ফিরে আসার প্রতীক্ষার কারণে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে আচমকা সব আলো নিভে গেল। দ্রুত টর্চ বের করে বারান্দায় গিয়ে ডাকলুম, কালীপদ কালীপদ!

কালীপদ সাড়া দিয়ে বলল, টেবিলে লণ্ঠন আর দেশলাই আছে স্যার! লোডশেডিং। তবে বেশিক্ষণ থাকবে না। আলো এসে যাবে।

সে বারান্দায় টর্চ জ্বেলে উল্টোদিকে চলে গেল। ঘরের একটা টেবিলে দেখলুম, চিনা লণ্ঠন আর দেশলাই রাখা আছে। আলো জ্বেলে দিলুম। কিন্তু বাইরের অন্ধকার বড় বেশি গাঢ় দেখাল। বারান্দায় গিয়ে গেটের দিকে এবং ফোয়ারার দিকে বার বার টর্চের আলো ফেলছিলুম। দু'ব্যাটারি টর্চের আলো ফোয়ারা অব্দি গিয়েই অন্ধকারের গায়ে নেতিয়ে পড়ছে। হলঘরের সামনে বারান্দায় কালীপদ একটা লণ্ঠন জ্বেলে দিল। কে জানে কেন-- হয়তো রানীমাকে লেখা উড়ো চিঠিগুলোর কথা মনে পড়েই ভয় পাচ্ছিলুম। তাই নিজকে সাহস যোগাতে ঘুরে ঢুকে ফায়ার আর্মসটা নিয়ে ডান হাতে রেখে চাদর ঢাকা দিলুম। গেটের দিকে টর্চের আলো ফেলেছি, চোখের ভুল কি না জানি, যেন দেখলুম, ফুলবাগানের দিকে কেউ বসেছিল। এইমাত্র গুঁড়ি মেরে বাউন্ডারি ওয়ালের দিকে সরে গেল।

আরও কয়েক পা এগিয়ে টর্চের আলো ফেললুম। কালীপদ চেঁচিয়ে বলল, কী দেখছেন স্যার?

চেঁচিয়ে বললুম, ফুলবাগানের ওদিকে কে যেন বসেছিল।

কালীপদ তার টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেল। তারপর টর্চ নিভিয়ে হাসতে হাসতে বলল, দেখো কাণ্ড!

রানীমার কথা শোনা গেল, কী হয়েছে রে কালী?

আজ্ঞে কিছু হয়নি। বলে কালী বারান্দার নীচের লন দিয়ে আমার কাছে চলে এল চাপা স্বরে বলল, রানীমা শুনলে খেপে যাবেন। আমি ঠাকুর-টাকুর মানি না

ভোরবেলা নিজের হাতে নিজের আমাশা তুলে ফেলে দিয়ে আসতে বলব। জল দিয়ে ধুইয়ে তবে ছাড়ব। হুঃ। আমাশা বলে যেখানে-সেখানে বসতে হবে? খিড়কির দোর খুলে পুকুর পাড়ে গিয়ে বসলেই পারতেন। এদিকে ভূতের ভয়। আবার মুখে--

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, ভটচাযমশাই নাকি?

কালীপদ হাসল। আবার কে? ক্যাক্টির বাগানের ওপাশে মাটিটুকু সিঁডবেড করার জন্য খুঁজে রেখেছিলুম। হয়তো সেখানেই অপকম্ম করে গেলেন। হাতে গাড়ু নিতে পেরেছেন। আর পুকুরের দিকে যাবার কী দরকার? নোংরা মানুষ। বরাবর নোংরা।

কালীপদ থুথু ফেলল। বললুম, আহা! আমাশা হলে মানুষের জ্ঞানগম্যি থাকে না।

কালীপদ হাসতে হাসতে গেটের দিকে গিয়ে গেট ঠিকমতো বন্ধ আছে কি না দেখে এল। তারপরই আলো জ্বলে উঠল। ভটচাযমশাইকে কোথাও দেখতে পেলুম না।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ফিরে এসে বললেন, লোডশেডিং সবখানেই হচ্ছে। এতে ভয় পাওয়ার কী আছে?

একটু হেসে বললুম, না। ভটচাযমশাইয়ের কাণ্ড! আমি আবছা দেখে চোর ভেবেছিলুম।

কর্নেল হাসলেন। আহা! বেচারার বড্ড আমাশা! বলে তিনি ঘরে ঢুকলেন। চিনে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আমি নিজে গেলে ভাল হত। তবে এতে থানার বাবুদের মনে সন্দেহ হত। তাই কালীপদই যাক রানীমার চিঠি নিয়ে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক দেখাবে।

ওই রাস্তায় কালীপদ একা যাবে? রাস্তায় তো আলো নেই।

কালীপদকে তুমি চেনো না। বলে কর্নেল বারান্দায় গেলেন।

কালীপদ এগিয়ে আসছিল সাইকেল নিয়ে। সে এসে বলল, রানীমা বললেন, বোসসায়েবকে থানায় গিয়ে ফোন করতে হবে। চিঠি দিলেন। আমি যাব আর আসব। জবাকে বলে এলুম, আপনাকে আবার কফি দিয়ে যাবে।

থানা কতদূরে?

বিজয়গড়ে ঢোকার মুখেই বড় রাস্তার ধারে। থানার বাবুদের কাউকে চিঠিটা দিয়েই চলে আসব। ওঁরা সায়েবকে টেলিফোন করে দেবেন। স্যার! দয়া করে যদি গেটটা একটু--

কর্নেল সিঁড়ি বেয়ে নেমে বললেন, নিশ্চয়। ভটচাযমশাইয়ের আমাশা। তোমার বউ রান্নাঘরে। গেট ভেতর থেকে বন্ধ তো রাখতেই হবে।

কালীপদ সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে গেট খুলে বেরিয়ে গেল। কর্নেল গেটটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে এলেন। বললেন, মিসেস সিংহ-- মানে, রানীমা

বলছিলেন, একটু দূরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া। তাই এখানে লোডশেডিং কদাচিৎ হয়। বিশেষ করে শীতকালে তো হয়ই না। আজ হঠাৎ কেন যে হল!

উনি ঘরে ঢুকলে বললুম, বাচ্চুবাবুর ঘরের কোনও কথা হয়নি ওঁর সঙ্গে?

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, তুমি এ প্রশ্ন করবে তা জানতুম। বাচ্চুর সেলার দেখার পর এই শীত সন্ধ্যায় তোমার একটু ইচ্ছে-টিচ্ছে জেগেছে।

ড্যাট্! বলে হেসে ফেললুম। তবে হ্যাঁ। বাচ্চুবাবু থাকলে এবং অফার করলে অন্তত দু-তিন পেগ হুইস্কি খাওয়া যেত। আপনি তো বিয়ার বা একটু-আধটু ব্রান্ডিতে সন্তুষ্ট। আপনিও বঞ্চিত হতেন না।

কর্নেল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, রানীমা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তখন বলেননি। বললেন, যে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। কালীপুজোর পরদিন সকালে কালীপদ বাচ্চুকে ঘুম থেকে ওঠাতে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল, অন্যান্য রাতের মতো সে কাঠের বেড়া ডিঙিয়ে বাড়ি ঢুকেছে। হলঘরের দরজা সে না ফেরা অব্দি ভেজানো থাকত। বাচ্চু এসে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিত। তো কালীপদ দেখেছিল, সদর দরজা ভেজানো আছে। তা থাকতেই পারে। মাতাল বাচ্চু দরজা বন্ধ করেনি। এই ভেবে কালীপদ ওপরে তার ঘরে যায়। তার ঘরের দরজাও ভেজানো ছিল। দরজা ঠেলতেই খুলে যায়। তারপর কালীপদ অবাক হয়ে দেখে, ঘরের বিছানাপত্র তচনচ হয়ে আছে। তাছাড়া টেবিলের ড্রয়ারগুলো বেরিয়ে আছে। ম্যাগাজিনগুলো মেঝেয় পড়ে আছে। আলমারি, ওয়াড্রোবি আর সেলারের তালা ভাঙা। ছুটে গিয়ে সে রানীমাকে জানায়। রানীমা অনেক কষ্টে ওপরে উঠে নিজের চোখে সব দেখতে পান। এই ব্যাপারটা তিনি পুলিসকে, এমন কি বোসসায়েবকেও জানাননি। কারণ বিলিতি মদের সেলার থাকায় দত্তকপুত্র বাচ্চুর প্রতি প্রশ্রয় দেওয়াটা প্রকট হবে। লজ্জায় পড়ে তো যাবেনই। আসলে তখনও তাঁর মনে বাচ্চু সম্পর্কে কিছুটা স্নেহ ছিল। তিনি গোপনে মিস্ত্রি ডাকিয়ে নতুন তালার ব্যবস্থা করেন। তার আগে বাচ্চুর ঘর আগেরমতো সাজানো হয়েছিল। তাছাড়া সিন্দুকের চাবিটা বাচ্চু কোথায় রেখেছে,তা তন্ন তন্ন নিজে খুঁজেছিলেন। কালীপদকে সিন্দুক রহস্য ফাঁস না করে শুধু একটা অদ্ভুত গড়নের চাবির কথা বলেছিলেন। কালীপদও ঘরে তেমন কোনও চাবি খুঁজে পায়নি। যাই হোক, এরপর তিনি নতুন তালা এঁটে দেন ঘরে।

পুরনো তালাটা কী অবস্থায় ছিল?

তালাটা চোর ভাঙা অবস্থায় বাইরে ছুড়ে ফেলেছিল। পরদিনও যখন বাচ্চু এল না, তখন কালীপদ বিজয়গড়ে গিয়ে তার বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিয়েছিল। তারা বলেছিল, বাচ্চুকে তারা দেখেনি। এরপর রানীমা পুলিসে খবর দেন। বোসসায়েবকে চিঠি লিখে ডেকে পাঠান।

ব্যাপারটা তা হলে বোসসায়েবের খবরের সত্যতা প্রমাণ করছে। বাচ্চুকে খুন করে পুঁতে ফেলা হয়েছে।

কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন, বাচ্চুর পচাগলা লাশ যতক্ষণ না কোথাও পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা লাশ পাওয়া না গেলেও যে তাকে সত্যি খুন করা হয়েছে, তার প্রমাণ না পাচ্ছি, ততক্ষণ সে জীবিত ধরে নিয়েই পা বাড়াতে হবে। যাই হোক, তুমি কৌতূহলী বলেই কথাগুলো জানালুম।

এতক্ষণে চাদরের ভেতর থেকে ফায়ার আর্মসটা বের করে বালিশের তলায় রাখলুম। কর্নেল ভুরু কুঁচকে তাকালেন। তারপর একটু হেসে বললেন, লোডেড ফায়ার আর্মস ওভাবে রাখতে নেই। তোমার বড় ব্যাগের চেন খুলে ঢুকিয়ে রাখো। ব্যাগে সাবধানে হাত দেবে। ওহ্ জয়ন্ত! তুমি মাঝে মাঝে অকারণে বড্ড বেশি ভয় পাও। ভাগ্যিস, আমাশা-আক্রান্ত ভটচাযমশাইয়ের দিকে গুলি ছোড়নি। হালদারমশাই হলে সত্যি অন্তত দু'রাউন্ড ফায়ার করে বসতেন।

কিছুক্ষণ পরে কালীপদর বউ জবা মাথায় ঘোমটা টেনে কফির ট্রে রেখে চলে যাচ্ছিল। কর্নেল বললেন, জবা, রানীমা এখন কী করছেন?

জবা মৃদুস্বরে বলল, ঠাকুমার মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। ঠাকুরমশাই কিছুতেই ডাক্তারের ওষুধ খেতে চাইছেন না। রানীমার কাছে আমাশার ট্যাবলেট আছে।

তোমার বাচ্চা কি এখনই ঘুমিয়ে পড়ল?

আজ্ঞে না। দোলনায় শুইয়ে রেখেছি। রানীমা একটা চাকা লাগানো ভাল দোলনা কিনে দিয়েছেন। ওপরে লাল বল ঝুলনো আছে।

তুমি অমন করে একা বাচ্চাটাকে ঘরে রেখো না!

না। রানীমা আমার টুকুনকে খুব ভালবাসেন। নিজের ঘরের মেঝেয় দোলনা ঠেলে নিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে খেলা করেন।

বাহ্। তা রানীমা তোমার বাচ্চাকে ভালবাসবেন বৈ কি। তোমার মা সুরবালা রানীমার কত সেবাযত্ন করত। আমি নিজে দেখেছি। তখন তুমি তো ফ্রকপরা মেয়ে।

কর্নেল সায়েবকে আমার মনে আছে। আমাকে লজেন্স চকোলেট কত কিছু দিতেন!

কর্নেল হাসলেন। তোমার মনে আছে তা হলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ কর্নেলসায়েব! রানীমা আমাকে আপনার কত গল্প শুনিয়েছেন। তবে দেখুন, উনি জাত-বিচার করেন না। রান্নার ঠাকুর ছিল। খুব চুরি করত। তাকে তাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, জবা। তুই রান্না কর। আমি তোর হাতে খাব। আমি তো ভয়ে সারা। রাজবাড়ির রান্না আমি পারি? শেষে উনি কী করে কী রান্না করতে হয়, সব দিনে দিনে শিখিয়ে দিলেন।

বাচ্চুবাবু তোমার রান্না খেত তো?

খেত। বাচ্চুবাবুও খুব ভালমানুষ ছিল। নেশাটেশা করত বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি।

তুমি কালীপদর মতো লেখাপড়া একটু-আধটু শিখেছ, না শেখোনি?

রানীমা দুপুরবেলা আমাকে পড়া শেখান। নাম সই করা শিখেছি।

বাচ্চুবাবুর সঙ্গে টমসায়েবের মেয়ে আইভির আলাপ ছিল তুমি জানো?

জবা এই আকস্মিক প্রশ্নে একটু বিব্রত বোধ করছিল। আস্তে বলল, ওই মেমসায়েবই তো সর্বনাশের মূলে।

জবা! তুমি আমার মেয়ের মতো। লজ্জা কোরো না। বাচ্চুবাবুকে খুঁজে বের করতে আমি তোমারও সাহায্য চাই। আমি যা জিজ্ঞেস করব, ঠিক-ঠিক উত্তর দেবে তো?

আজ্ঞে কন্নেলসায়েব! যা জানি তা বলব বৈ কি।

কালীপুজোর রাতে নাকি বাচ্চুবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। সেই দিনের কথা জানতে চাই। বাচ্চুবাবুর কাছে সেদিন কি তার কোনও বন্ধু এসেছিল? সকালে বা দুপুরে বা বিকেলে? কিছু মনে পড়ছে?

জবা আবার একটু ইতস্তত করার পর বলল, কাকেও আসতে দেখিনি। এলে মনে থাকত।

কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, মেমসায়েব কি কখনও রানীমার অজান্তে এ বাড়ি এসেছে?

জবা মাথা নেড়ে বলল, না। এলে আমার চোখে পড়ত।

আচ্ছা, সেইদিনের কথায় আসছি। বাচ্চুবাবু কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল?

সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরে আরতি হল। তারপর ঠাকুরমশাই এসে বাচ্চুবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, বাচ্চু, কালীপুজো দেখতে যাবে না? বাচ্চুবাবু রাগ করে বলল, আপনি যাবেন তো যান না! আমি যখন ইচ্ছে যাব। বাচ্চুবাবু দোতলায় তার ঘরের বারান্দায় ছিল। ঠাকুরমশাই নীচে। ঠাকুরমশাই বাচ্চুবাবুকে রাগিয়ে দিয়ে মজা পেতেন। যখন তখন মেমসায়েবের কথা বলে ঠাট্টা করতেন। বাচ্চুবাবু আরও খেপে যেত। কথাটা মনে আছে। ঠাকুরমশাই বললেন, তোমার মেমসায়েব কালীপুজো দেখতে এসেছে। জনসায়েব কোন মুল্লুকে বেড়াতে গেছে। দুপুরবেলা বাংলোয় যেতে দেখেছি মেমসায়েবকে। অমনি বাচ্চুবাবু খেপে গিয়ে বলল, তবে রে বিট্‌লে বামুন! দেখাচ্ছি মজা! জবা হেসে ফেলল। ঠাকুরমশাই দৌড়ে নিজের ঘরের দিকে পালিয়ে গেলেন। বাচ্চুবাবুও নেমে এসে দৌড়ুল। রানীমা ঘর থেকে বললেন, কী হয়েছে বাচ্চু? কাকে বকাবকি করছিস? বাচ্চু গেরাহ্যি করল না। তবে এমন প্রায়ই হত। ঠাকুরমশাই ঘরে

ঢুকে দরজা এঁটে দিতেন। সে এক রগুড়ে কাণ্ড। ঠাকুরমশাই যা মজার--

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, আমি জিজ্ঞেস করছি বাচ্চুবাবু কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল?

জবা বলল, হ্যাঁ। রানীমার ঘরে টিভিতে একটা বই হচ্ছিল। রাত আটটার পরে। বাচ্চুবাবু বলে গেল, কালীপুজো দেখতে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে।

কর্নেল বললেন, ঠিক আছে জবা। তুমি নিজের কাজ করো গে।

।। ছয় ।।

সেই সন্ধ্যায় প্রায় এক ঘণ্টা পরে কালীপদ ফিরে এসে বলেছিল, বড়বাবুকে চিঠি দিলুম। উনি ফোন করে বললেন, ডি আই জি সায়েবকে এখন অফিসে পাওয়া গেল না। রানীমার খবর দিয়ে রাখছেন। অফিসের লোকে খবর পৌঁছে দেবে।

রাত্রে খাওয়ার সময় রানীমা বললেন, অরবিন্দ খবর পেলে ঠিকই এসে যাবে। কিন্তু চাবির ব্যাপারে কোনও কথা যেন ওকে বলবেন না।

কর্নেল বললেন, না। আমি শুধু ওঁর কাছে বাচ্চুবাবুর ব্যাপারে পুলিসের হাতে কী ইনফরমেশন আছে, সেগুলোই জানতে চাইব। অবশ্য অরবিন্দবাবু আমার নাম শুনে থাকতেও পারেন। কারণ এখানে আসবার আগে অমি পুলিসের ওপরমহলে ঠিক জায়গায় জানিয়ে এসেছি, যাতে প্রয়োজনে স্থানীয় পুলিসের সাহায্য পাই। অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে পুলিসের সাহায্য নিতে হয়।

কথায়-কথায় ভটচাযমশাইয়ের আমাশার কথা এসে গেল। রানীমা বললেন, হরেকেষ্টর সব ভাল। শুধু নানান শুচিবায়ুতে ভোগে।

বললুম, ওঁর অসুখটা আন্ত্রিক নয় তো? তা হলে কিন্তু ভয়ের কথা।

না। আমাশা ওর বারোমাসের ব্যাধি। রানীমা হাসতে হাসতে বললেন, কবরেজি মতে, আমাশা হলেই নাকি জোলাপ খেতে হয়। ওর জোলাপ ইসবগুলের ভুষি। সব সময় কিনে এনে রাখে।

এই সময় বাইরে কালীপদর হাঁকডাক শোনা গেল। ঠাকুরমশাই! ওদিকে নয়। সিডবেড নষ্ট করলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। পুকুরপাড়ে যান। চলুন আমি ঘাটে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

রানীমা মুখে কাপড়চাপা দিয়ে বললেন, বড্ড নোংরা হরেকষ্ট! এদিকে বেজায় ভীতু। দিনদুপুরে ভূত দেখতে পায়।

খাওয়ার পর রানীমার কাছে বিদায় নিয়ে আমরা আমাদের ঘরে এলুম। রাত প্রায় দশটা। কর্নেল বললেন, শুয়ে পড়ো জয়ন্ত! ভোরে তোমাকে নিয়ে বেরব।

বললুম, সর্বনাশ! এই প্রচণ্ড শীতের ভোরে?

জগিং করতে করতে যাব। দেখবে, শীত কেমন জব্দ হয়ে যাচ্ছে।

আপনার মিলিটারি বডি।

কর্নেল হাসলেন। সারেংডির জঙ্গলের মুখে একটা টিলা আছে। সেই টিলায় উঠে সূর্যোদয় দেখব। দেখে এসেছি, নদীর ওপর পুরনো কাঠের ব্রিজটা কংক্রিটের ব্রিজ হয়েছে। বিহারের আদিবাসীরা ব্রিজ পেরিয়ে বিজয়গড়ের বাজারে বেচাকেনা করতে আসে। নদীটা ওয়াটার ড্যামের জন্য ওখানে নেহাত ঝরনার রূপ নিয়েছে। জলের সেই স্বচ্ছতাও নেই। তবে দু'ধারে পাথরের ফাঁকে বুনো ফুল দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

এবং প্রজাপতি!

হ্যাঁ। প্রজাপতি। তবে শিশির না শুকোলে প্রজাপতিরা বেরোয় না।

সেই টিলাটা এখান থেকে কত দূরে?

মাত্র তিন-সওয়া তিন কিলোমিটার।

আর কিছু বললুম না। মশারি খাটিয়ে ভেতরে ঢুকে কম্বল মুড়ি দিলুম। কর্নেল চেয়ারে বসে চুরুট টানতে থাকলেন। মনে মনে ঠিক করলুম, কর্নেল যতই টানাটানি করুন। ভোরে আমি কিছুতেই বিছানা ছেড়ে বেরুব না। ভোরে এই এলাকায় যা বিচ্ছিরি কুয়াশা দেখেছি!

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ডাকলেন, জয়ন্ত!

সাড়া দিলুম না। ঘুমের ভান করে পড়ে রইলুম।

কর্নেল বললেন, তুমি ঘুমোওনি জয়ন্ত! বুঝতে পারছি ভোরে আমার সঙ্গে বেরুতে তোমার বেজায় অনিচ্ছা। ডার্লিং! টিলায় উঠে সূর্যোদয় দেখার কথা তোমাকে বিভ্রান্ত করেছে। একটু চিন্তা করলেই তুমি বুঝতে পারতে, ঘন কুয়াশার মধ্যে সূর্যোদয় দেখা সম্ভব নয়।

অগত্যা মুখ খুলতে হল। তা হলে সারেংডির টিলার মাথায় কষ্ট করে চড়ার দরকারটা কী?

কর্নেল হাসলেন। চাপা স্বরে বললেন, টিলাটার মাথায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ছোট্ট একটা বাংলো আছে। বাংলোতে এক ভদ্রলোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

কে তিনি?

সাসপেন্সটা ভাঙছি না। তুমি গিয়েই দেখবে। বলে কর্নেল উঠে দরজাটা বন্ধ করে

দিলেন। তারপর পোশাক বদলাতে গেলেন বাথরুমে। মশারির ভেতর থেকে দেখলুম, নাইট ড্রেস পরে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বড় আলোটা নিভিয়ে দিলেন। কিটব্যাগ থেকে কী সব বের করে টেবিলে ঝুঁকে বসে রইলেন। হাতে আতস কাচ। ওঁর পিঠের দিকটা চোখে পড়ছিল। তাই বুঝতে পারলুম না আতস কাচ দিয়ে কী দেখছেন।...

শীতকালের ভোর ছ'টায় বিছানা ছেড়ে ওঠা খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার। কিন্তু কর্নেল একটা সাসেপেন্সের টোপ ঝুলিয়ে রেখেছেন সামনে। কর্নেল পোশাক পরে তৈরি ছিলেন। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলুম। বেরিয়ে গিয়ে দেখলুম কাল ভোরের মতোই গাঢ় কুয়াশা সব কিছু ঢেকে রেখেছে। বারান্দায় কালীপদকে দেখে বুঝলুম, তাকে কর্নেল বলে রেখেছেন। কারণ গেটে রাত্রে তালা দেওয়া থাকে। সে তালা খুলে দিয়ে বলল, সারারাত ঠাকুরমশাই জ্বালাতন করেছেন। একা বেরুনোর সাহস নেই। শেষ রাত্তিরে অসুখ কমেছে হয়তো। আর ডাকাডাকি করেননি।

মোরাম রাস্তায় কর্নেল জগিংয়ের ভঙ্গি করে বললেন, নাহ্। বড্ড বাজে রাস্তা। পাথর উঁচিয়ে আছে। এ বয়সে ঠ্যাং ভাঙতে রাজি নই।

প্রায় দু'কিলোমিটার এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরে ব্রিজ পাওয়া গেল। ডাইনের সংকীর্ণ রাস্তাটা গেছে টমসায়েবের বাংলোর দিকে। সেই টিলাটা কালো হয়ে আছে। কুয়াশার ভেতর আবছা দেখা যাচ্ছিল সেটা। ব্রিজ পেরিয়ে কর্নেল বললেন, এবার ধীরে-সুস্থে যাওয়া যেতে পারে।

কিছু দূর হাঁটার পর পিচ রাস্তা পাওয়া গেল। কর্নেল বললেন, যে-রাস্তায় এলুম, সেটাও পিচ রাস্তা হয়ে যাবে। কবে হবে বলা অবশ্য কঠিন। দুই রাজ্যের সরকারের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। জনসায়েব বলছিল, দুই রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা মাপজোক করে ফেলেছেন। সারেংডি ফরেস্টে ট্যুরিস্টদের জন্য বাংলো তৈরি হচ্ছে। আট বছর আগে সারেংডিতে প্রচুর জন্তু-জানোয়ার দেখে গেছি। এখন নাকি কদাচিৎ তাদের দেখা যায়। চোরাশিকারিদের যা উৎপাত।

পিচ রাস্তা থেকে সংকীর্ণ একটা রাস্তা বাঁক নিতে নিতে টিলায় উঠেছে। এতক্ষণে টিলার মাথায় গাছপালার ফাঁকে ছোট্ট একটা বাংলো চোখে পড়ল। মাউন্টেনিয়ারিংয়ে ছাত্র জীবনেই ট্রেনিং নিয়েছিলুম। কর্নেলের সঙ্গী হয়ে তা মাঝে মাঝে কাজে লাগে। কর্নেলের তো সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা আছে। রাস্তাটা ছেড়ে ঝোপ-জঙ্গল আর পাথরের ভেতর দিয়ে বাংলো লক্ষ করে দু'জনে সোজা উঠে গেলুম।

তারপর কাঠের বেড়ার ধারে-ধারে সাবধানে এগিয়ে গেটের সামনে গেলুম। পুবদুয়ারি টালিতে ছাওয়া বাংলোর বারান্দায় চেয়ারে বসে কেউ দু'হাতে কাপ ধরে চা

খাচ্ছিলেন। মাথায় হনুমান টুপি। পরনে সোয়েটারের ওপর জ্যাকেট। আমাদের দেখতে পেয়ে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। অমনি তাঁকে চিনতে পারলুম। প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার।

বললুম, কী আশ্চর্য! হালদারমশাই, আপনি এখানে?

হালদারমশাই হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আর কইবেন না। ক্লায়েন্ট আমারে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাইতাছে। কী ঠাণ্ডা জায়গা! দুইখান কম্বলেও শীত যায় না। হোল নাইট ঘুম হয় নাই।

কর্নেল বললেন, জয়ন্তকে কেমন একখানা সাসপেন্স দিলুম!

বললুম, তা দিলেন বটে! আমি কল্পনাও করিনি হালদারমশাইকে এখানে দেখতে পাব।

হালদারমশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চৌকিদার কানে কালা। বয়সে বুড়া। চা করতে বলে আসি। কফি নাই কর্নেল স্যার! চা-ই খান। আমার মাথার ঠিক ছিল না। ক্লায়েন্টের লগে-লগে আইয়া পড়ছি।

কর্নেল বললেন, ব্যস্ত হবেন না। আপনার ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

নাহ্। কাইল রাত্রে মিট করবে কইছিল। আর পাত্তা নাই।

বলে হালদারমশাই বাংলোর পেছন দিকে চলে গেলেন। টালি-চাপানো বাংলোয় পাশাপাশি মাত্র দুটো ঘর। বারান্দায় কাঠের যেমন-তেমন একটা টেবিল আর দুটো নড়বড়ে চেয়ার। দেয়াল ঘেঁষে সিমেন্টের বেঞ্চ। ভীষণ ঠাণ্ডা। ক্লান্তির জন্য সেখানে বসতে যাচ্ছিলুম, কর্নেল বললেন, এই চেয়ারে বসো জয়ন্ত। এটা আমার ভার সহ্য করতে পারবে না। আমি বেঞ্চে বসি।

বললুম, এই সাসপেন্সের অর্থ হয় না। কাল বিকেলে রাজবাড়িতে ফিরে বললেই পারতেন যে—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন, শীতের ভোরে হাঁটার কষ্টটা কেমন পুষিয়ে গেল বলো!

বুঝতে পারছি কাল বেড়াতে গিয়ে হালদারমশাইয়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল।

কর্নেল হাসলেন। হয়েছিল মানে, ওয়াটার ড্যামের ধারে জঙ্গল থেকে একটা নীল সারস উড়ে এদিকে আসছিল। তাকে বাইনোকুলারে ফলো করে দেখি এই বাংলোর সামনে হালদারমশাই দাঁড়িয়ে আছেন। তক্ষুণি এসে হাজির হয়েছিলুম। উনিও তোমার মতো আমাকে এখানে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। আমরা তো ওঁকে বলে আসিনি কোথায় যাচ্ছি।

হালদারমশাই এসে গেলেন। চেয়ারে বসে এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, কাইল

রাত্রে ক্লায়েন্টের এখানে আমার লগে মিট করার কথা ছিল। আসে নাই। কী করি কন কর্নেল স্যার?

ওয়েট করুন। আমি কাল বিকেলে আপনাকে বলেছিলুম, নলপাহাড়ির বাংলোতে আপনার ক্লায়েন্টের দাদা ফ্যামিলি নিয়ে ছুটি কাটাতে এসেছে। আজ রবিবার। বিকেলে জনসায়েব চিত্তরঞ্জন ফিরে যাবে। সে যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আইভি এ তল্লাটে আসার রিস্ক নেবে না।

হালদারমশাই রুমালে নাক মুছে বললেন, মেমসায়েব কইছিল, রাত্রে কে তারে নাকি মোটর সাইকেলে লইয়া আইবে।

বলেছে যখন, তখন আইভি আসবে। জনসায়েব চলে যাওয়ার পর অন্ধকার নামলেই সে আসতে পারবে। বিজয়গড়েও যেখানে আইভি আছে, সেখান থেকে দিনের বেলায় বাইরে বেরুনো তার পক্ষে নিরাপদ নয়। অলকেন্দু নিখোঁজ হওয়ার কেসে পুলিস তাকেও যে খুঁজছে! আপনাকে তো সবই বলেছি। বলে আমার দিকে তাকালেন। জয়ন্ত ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানার জন্য উৎসুক। হালদারমশাই বলবেন, নাকি আমি বলব?

গোয়েন্দামশাই একটু হেসে বললেন, আপনি কন। আমার মুড নাই।

কর্নেল আমাকে যে ঘটনা শোনালেন, তার বিবরণ এই :

শুক্রবার রাত দশটায় আমরা যখন হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলুম, তখন হালদারমশাইও তাঁর বাড়িতে ক্লায়েন্ট মেমসায়েবের ফোনের প্রতীক্ষা করছিলেন। সওয়া দশটা নাগাদ মেমসায়েব তাঁকে ফোন করে জানায়, তারা স্বামী-স্ত্রী শেয়ালদার হোটেল ছেড়ে রিপন স্ট্রিটে আসছিল। সেখানে মেমসায়েব অর্থাৎ আইভির স্বামী জেমস বিশ্বাসের এক আত্মীয় থাকে। কিন্তু ট্যাক্সি না পেয়ে দু'জনে রিকশাতে চেপে আসছিল। মৌলালিতে ট্রাফিক সিগনাল না পেয়ে রিকশা বাঁদিকের ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ আইভির গলায় হ্যাঁচকা টান পড়ে। সেই পরচুলাপরা লোকটাই হবে, যদিও রিকশার হুড তোলা ছিল বলে তাকে আইভি দেখতে পায়নি-- লকেটশুদ্ধু চেনটা ছিনতাই করে ভিড়ে উধাও হয়ে যায়। আইভি হালদারমশাইকে বলে, ওই লকেটটা খুব দামী। যে 'স্কাউন্ড্রেল' ওটা হাতানোর জন্য তাদের অনুসরণ করে কলকাতা এসেছিল, সে বিজয়গড়ের লোক। কারণ আইভি যখন বিজয়গড়ে খ্রিস্টান মিশন স্কুলে শিক্ষিকা ছিল, তখন তাকে সে বহুবার দেখেছে। কিন্তু তার পরিচয় জানে না। তার পরিচয় জানবার জন্যই আইভি প্রাইভেট ডিটেকটিভের সাহায্য চেয়েছিল। এখন লকেটটাও সে উদ্ধার করতে চায়। তাই হালদারমশাই যদি তার সঙ্গে বিজয়গড়ে যান, তাঁর পুরো ফি সে দেবে। পুরো ফি কত, তা-ও সে জানতে চায়। হালদারমশাই রহস্যের গন্ধ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তাই তিনি তাকে বলেন, কাজ সফল হলে ম্যাডাম যা খুশি তা-ই দেবেন। তারপর কথামতো শনিবার ভোর ছ'টায় হালদারমশাই হাওড়া স্টেশনে যান। 'মেমসায়েব' বলেছিল সে একা যাবে। তার পরনে থাকবে জিনসের প্যান্ট-জ্যাকেট, লাল শার্ট আর চুলে লাল স্কার্ফ জড়ানো। সেখানে গিয়েই মুখোমুখি পরিচয় হয় ক্লায়েন্টের সঙ্গে। তার বয়স বাইশ-তেইশের মধ্যে বলে মনে হয়েছিল হালদারমশাইয়ের। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে চেপে পৌনে দশটায় আসানসোল পৌঁছেছিলেন দু'জনে। তারপর ট্রেন বদলে অণ্ডাল জংশন হয়ে গৌরাঙ্গডিহিতে পৌঁছান বেলা দেড়টা নাগাদ। তারপর মেমসায়েব তাঁকে বলে, বিজয়গড়ে থাকার মতো তেমন হোটেল নেই। তিনি বাসে চেপে বিজয়গড় গিয়ে সেখান থেকে এক্কাগাড়ি ভাড়া করে যেন সারেংডি বনবাংলোয় চলে যান। চৌকিদারকে টাকা দিলেই থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওখানে সচরাচর কেউ থাকে না। খালি ঘর পাওয়া যাবে। আর আইভি তাঁর সঙ্গে রাত দশটা নাগাদ গিয়ে দেখা করে আসবে। বিজয়গড়ে সে একা সন্ধ্যার বাসে যাবে। ওখানে তার এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বন্ধু আছে। সেই বন্ধুর স্বামীর নাম যোশেফ। যোশেফের মোটর সাইকেল আছে। কাজেই তার অসুবিধে নেই। তারপর হালদারমশাইকে কী করতে হবে, সে রাত দশটা নাগাদ এই বাংলোতে এসে জানাবে।...

ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল। চা খেতে খেতে মনে পড়ল, শেয়ালদার হোটেলে থাকার সময় সন্ধ্যাবেলায় পরচুলাপরা লোকটা আইভির চেন ধরে টান দিয়েছিল এবং আইভি হোটেলের সিঁড়িতে ওঠার সময় লকেটটা মুঠোয় চেপে ধরেছিল। এটা হালদারমশাইয়ের মুখে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে বসে শুনেছিলুম। তাই বললুম, হিরে বসানো লকেট নাকি?

হালদারমশাই বললেন, ক্লায়েন্ট সে-সম্পর্কে কিছু বলে নাই। শুধু কইছিল, 'দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি ভ্যালুয়েবল অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল অর্নামেন্ট।'

বললুম, হিস্টোরিক্যাল—ঐতিহাসিক? কর্নেল!

কর্নেল আমার বক্তব্য আঁচ করে শুধু বললেন, হুঁঃ! তুমি ঠিকই ধরেছ।

তা হলে তা গলায় ঝুলিয়ে বেড়াত কেন আইভি?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, যে-কারণে রানীমা সিন্দুকের চাবি সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন।

হালদারমশাই বললেন, সিন্দুকের চাবি? সিন্দুক ক্যান?

হালদারমশাই! সেকেলে অভিজাত বা রাজ-জমিদারদের বাড়িতে সিন্দুক থাকে। এ কোনও নতুন কথা নয়।

বললুম, কর্নেল! বাচ্চুর উপহার। তাই না?

কর্নেল বললেন, তাছাড়া আর কী?

হালদারমশাই বললেন, ক্লায়েন্টের লগে কথা কইয়া বুঝছি, সে এই এরিয়ায় গোপনে থাকতে চায়।

হ্যাঁ। সে এলে তাকে সতর্ক করে দেবেন, পুলিস তাকে খুঁজছে। কথাটি আবার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিলুম।

হালদারমশাই একটু অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু অরে দেখলে বুঝবেন মুখখান খুব ইনোসেন্ট। এক্কেরে ইয়ং এজ। শি ইজ নট এ ক্রিমিন্যাল। চৌতিরিশ বৎসর পুলিসে চাকরি করছি। মুখ দেইখ্যাই কইয়া দিতে পারি ইনোসেন্ট, না ক্রিমিন্যাল।

বুঝলেন না? সব পুলিস তো আপনার মতো নয়। বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলি। আপনি বিশ্রাম করুন। আপনার ক্লায়েন্টের সঙ্গে সম্ভবত আজ সন্ধ্যার পরই আপনার দেখা হবে। লকেটের ব্যাপারটাতে গুরুত্ব দেবেন। তাকে বলবেন, এই লকেট সে কোথায় কার কাছে কীভাবে পেয়েছিল, সে-সব খুলে না বললে আপনি ওটা উদ্ধার করে দিতে পারবেন না।

আশা করি, আগামীকাল আপনি রাজবাড়িতে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবেন। এই চব্বিশটা ঘণ্টা আপনি কষ্ট করে একা থাকুন। একা থাকা আপনার দরকার। তবে সাবধানে থাকবেন। খুব সাবধানে। বিশেষ করে বিকেলের পর থেকে কাল সকাল পর্যন্ত। কুয়াশা আর অন্ধকার শত্রুপক্ষকে সুযোগ দেবে।

গোয়েন্দাপ্রবর শ্বাস ছেড়ে শুধু বললেন, হঃ।...

আমরা দু'জনে এবার ঘোরালো পথ দিয়ে নেমে এলুম। কর্নেল বললেন, জনসায়েব গাড়ি নিয়ে সারেংডি ফরেস্টে বেড়াতে গেল। চলো! এই সুযোগে বাংলোর চৌকিদার শিউপুজনের সঙ্গে একটু গল্প করা যাবে।

ততক্ষণে সূর্য উঠেছে এবং কুয়াশা পাতলা হয়ে গেছে। নদীর ব্রিজে গিয়ে কর্নেল বাইনোকুলারে নলপাহাড়িতে টমসায়েবের বাংলোটা দেখে নিলেন।

এই বাংলোটা টিলার গায়ে। তাই রাস্তাটা সোজা উঠে গেছে গেটে। কর্নেলকে দেখে চৌকিদার এগিয়ে এসে সেলাম দিল। বলল, ছোটসাব তো আভি জঙ্গলে চলিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন, আচ্ছা শিউপুজন ; একটা কথা জানতে চাইছি। ঠিক ঠিক বললে বখশিস পাবে।

শিউপুজন হাসল। কর্নিলসাব! আপনি বড়াসাবের দোস্ত। বড়াসাব জিন্দা থাকলে কেত্ত খুশি হতেন। উনহি না আছে তো কী হয়েছে? কী পুছ করবেন, করুন। হামি ঠিক ঠিক জবাব দিবে।

শিউপুজন! গত কালীপুজোর রাতে তুমি কি বাংলোয় ছিলে?

সামতক ছিল হামি। বিকেলে আইভি মেমসাব এক্কাগাড়ি চেপে আসল। ছোটাসাব

আসলেন না। তো হামি উনহির কাছে ছুট্টি লিয়ে বিজয়গড় চলিয়ে গেল। বহু বালবাচ্চা আছে। কালীপূজা দেখবে।

কখন ফিরে এসেছিলে?

এই টাইমে। আইভি মেমসাবকে খুব পেরেসান মালুম হল। হামি ঠিক সমঝালাম! রাতমে উনহির সাথে রাজবাড়ির হারামি লড়কা বাচ্চুবাবু জরুর ছিল। কাহে কী, আইভি মেমসাব একেলা আসলে বাচ্চুবাবু ভি আসবে। হামি ছোটা আদমি কর্নিলসাব! হামি নোকর আছি. আইভি মেমসাব ঔর বাচ্চুবাবু ভি হামাকে বখশিস দিত। ছোটসাবকে হামি কুছু বলিনি। পুলসকে ভি বলিনি। আপনি বড়াসাবের দোস্ত কর্নিলসাব। আপনাকে সব বললাম।...

।। সাত।।

কর্নেল টিলার মাথায় অশ্বত্থগাছে সেক্রেটারি বার্ড বা কেরানি পাখিটাকে দেখতে না পয়ে নিরাশ হয়েছিলেন। বাংলোর উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে নেমে একটু দূরে ওয়াটার ড্যাম চোখে পড়ল। ঢালে জঙ্গল থাকায় তখন চোখে পড়েনি। কর্নেল বললেন, থাক্। এ বেলা আর ওদিকে নয়। ফেরা যাক।

হাঁটতে হাঁটতে বললুম, শিউপূজন লোকটিকে সরল আর ভিতু মনে হল।

কর্নেল বললেন, তুমি ওকে চেনো না। ও সরলও নয়, ভিতুও নয়। মাসে এ বাজারে পাঁচশো টাকা মাইনেতে সংসার চালানো কঠিন। তাই রোজগারের নানা ফিকিরে থাকে। বখশিসের লোভে আমাকে যা বলল, অন্য লোককেও তা-ই বলতে ওর দ্বিধা হবে না। তাছাড়া শিউপূজন গোপনে বাংলো ভাড়া দেয়-- শনিবার ও রবিবার এই দু'দিন বাদে। তুমি বুঝতে চেষ্টা করো। একটা লোক এই জনহীন বাংলোয় একা রাত কাটায়। কাজেই সে সাহসী। টমসায়েবের কবর আছে বাংলোর লনের কোণে। ব্যাপারটা এবার চিন্তা করো! ভূতের ভয়ও তার নেই।

তা হলে টাকা দিয়ে ওর মুখ বন্ধ করাও যায়?

নিশ্চয় যায়। তবে ওসব কথা আপাতত থাক। কফির জন্য মন ছটফট করছে।

কর্নেল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

রাজবাড়ির গেটের বাইরে কালীপদ একা দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেল বললেন, কী কালীপদ? এখানে কী করছ?

কালীপদ চাপা স্বরে বলল, আজ আবার সেই উড়ো চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছি।

আপনারা চলে গেলেন। তারপর আমি ফুলবাগানে কাজ করে জল-টল দিয়ে বাজার করতে বেরুচ্ছি, দেখি চিঠিটা পড়ে আছে।

রানীমাকে দিয়েছ তো?

আজ্ঞে। বলে সে ভেতরে ঢুকল। রানীমা বলছিলেন, কর্নেলসায়েবকে এ বাড়িতে দেখেও কার এত সাহস যে এখনও উড়ো চিঠিতে হুমকি দিচ্ছে?

কর্নেল হাসবেন। উড়ো চিঠি দেওয়া তো আমি আটকাতে পারব না। তুমি শিগগির কফির ব্যবস্থা করো কালীপদ! আর— ভটচাযমশাই কেমন আছেন?

খুব কাহিল অবস্থা। পুজো করতে পারেননি। খাটিয়ায় মড়ার মত শুয়ে আছেন।

আমাদের ঘরে তালা দেওয়া ছিল না। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখলুম, সব জানালা খোলা আছে। উত্তরের জানালা দিয়ে তীব্র ঠাণ্ডা আসছিল। তাই উত্তরের দুটো জানালা বন্ধ করে দিলুম। তারপরই চোখে পড়ল, কর্নেলের বিছানার পাশের টেবিলে এক টুকরো ছোট্ট পাথরের সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা কাগজ পড়ে আছে। বললুম, কর্নেল! এটা কী?

কর্নেল হাসলেন। আবার কী? আমাকেও উড়ো চিঠিতে হুমকি দিয়েছে। দেখি!

পাথরে বাঁধা চিরকুটটা খুলে উনি পড়লেন। তারপর আমাকে দিলেন। দেখি, একই লাল ডটপেনে লেখা চিঠি :

'পত্রপাঠ চলে যাও। নতুবা নরবলি হবে।দেবীর রক্ততৃষ্ণা
জেগেছে। বাঁচতে চাও তো শীঘ্র পালিয়ে যাও।'

কর্নেল চিঠিটা নিয়ে রানীমাকে লেখা আগের তিনটে চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বললেন, একই হাতের লেখা। মনে হচ্ছে, একটু ভয় পেয়েছে। তাই দেবীর নাম করে হুমকি দিয়েছে।

উনি চিঠিগুলো কিটব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলেন। বললুম, উত্তরের জানালা তো বন্ধ ছিল। কে খুলল?

কর্নেল বললেন, বিছানা পরিপাটি গুছোনো আছে দেখতে পাচ্ছ না? কালীপদ বা তার বউ হয়তো জানালা খুলে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে কালীপদ কফির ট্রে নিয়ে এল। তাকে জিজ্ঞেস করলুম, ওই জানালা দুটো কি তুমি খুলে দিয়েছিলে?

কালীপদ বলল, আজ্ঞে না। বউ আপনাদের ঘর পরিষ্কার করছিল। সে-ই খুলেছে। কেন স্যার?

বললুম, বড্ড ঠাণ্ডা আসছিল।

আজ্ঞে, রানীমার এই হুকুম আছে। সে শীত হোক কি বর্ষা হোক। ঘরের বাতাস

বের করে না দিলে নাকি অসুখ হবে। আপনারা গিয়ে দেখে আসুন। রানীমা উত্তরের জানালা খুলে বসে আছেন। কালীপদ একটু হাসল। উনি মোটাসোটা মানুষ তো! শীতে ওঁর আরাম। গরমে শুধু হাঁসফাঁস করে বেড়ান। দু'বেলা চান করেন। এই শীতে ভোরবেলা চান করে উনি মন্দিরে যান। ভাবুন!

কালীপদ চলে গেল। কর্নেলের কফি পান দেখে মনে হল, সত্যি ওঁর কফির জন্য মন ছটফট করছিল। কফি শেষ করে উনি বললেন, তুমি বসো জয়ন্ত! আমি একবার ভটচাযমশাইকে দেখে আসি। বেচারা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। ভাববেন, একবারও ওঁকে দেখে এলুম না। কাল রাত্রেও একবার গিয়ে খবর নেওয়া উচিত ছিল।

কর্নেল চলে গেলেন। আমি ধীরেসুস্থে কফি খাচ্ছিলুম। সেই সঙ্গে বিস্কুট, পটাটোচিপস আর চানাচুর সাবাড় করছিলুম। আমার খিদে পেয়েছিল খুব।

খাওয়ার পর নীচের লনে গিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে দেখলুম, কর্নেল মন্দিরের চত্বর থেকে বেরিয়ে ফুলবাগানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ফোয়ারা এবং ইঁদারার পাশে পাম্প-ঘরের আড়ালে তিনি অদৃশ্য হলেন। কালীপদ হাসিমুখে ডাইনিং রুমের বারান্দা থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। তারপর সে-ও ফুলবাগানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল।

তারপর প্রায় মিনিট কুড়ি কেটে গেল। বুঝলুম, কর্নেল এবং কালীপদ ক্যাকটাস নিয়ে আলাপ করছেন। জবা বারান্দা থেকে বলল, রানীমা খেতে বলছেন সায়েবদের। ন'টা বেজে গেছে।

রানীমাকেও দেখলুম মোটা ছড়ি হাতে বারান্দার একটা থামের কাছে এসে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, কালী। কথা শুনতে পাচ্ছিস না?

কর্নেলকে এতক্ষণে দেখতে পেলুম। পেছনে কালীপদ। কর্নেল কালীপদকে কিছু বললেন। সে লন হয়ে আমার কাছে চলে এল। বলল, ব্রেকফাস্ট করে আসুন স্যার। আমি দরজা বন্ধ করে এখানে থাকছি।

ডাইনিং রুমে খেতে বসে কর্নেল বললেন, ভটচাযমশাইয়ের শেষ রাত্রে জ্বর এসেছিল। ছেড়ে গেছে। কিন্তু শরীর ভীষণ দুর্বল। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। বরং ওঁর কবরেজমশাইকে ডেকে আনা উচিত ছিল।

রানীমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখটা আজ খুবই গম্ভীর। তিনি বললেন, কালী বাজারে গিয়ে ভবেশ কবরেজকে খবর দিয়ে এসেছে। এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। ভবেশের এত গরজ কেন বুঝি না। ওদিকে অরবিন্দকে খবর দেওয়া হল। এখনও তার পাত্তা নেই। আগে খবর পেলেই চলে আসত। গাড়ি আছে। ড্রাইভার আছে। বর্ধমান থেকে আসতে কতক্ষণই বা লাগে?

কর্নেল বললেন, মিসেস সিংহ বড় বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। আপনি নিশ্চিন্ত

থাকুন। আমি এবার ঠিক পথে পা বাড়িয়েছি।

রানীমা ঘরে ঢুকে বললেন, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না কর্নেলসায়েব! আমার রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। আপনি পাশে আছেন। এখন আমার আর কোনও চিন্তা নেই। চিন্তা শুধু নিজের রং ডিসিশন নিয়ে। বাচ্চুকে এ বাড়ি ঢোকাব, না এসব ঝামেলা হবে। তার বাবা-মায়ের কাছে আমি চিরকালের জন্য অপরাধী থেকে গেলুম।

রানীমার চোখে জল এসেছিল। চোখ মুছে বেরিয়ে গেলেন।

যাওয়ার পর কর্নেল ও আমি নিজেদের ঘরে ফিরে এলুম। কালীপদ একটু হেসে বলল, কুমড়োপটাশটা দেখলেন তো ! কী পেল্লায় হয়ে গেছে। ওটার টব বদলাতে হবে।

কর্নেল বললেন, রানীমা বলছিলেন ভবেশ কবরেজমশাই এখনও কেন আসছেন না!

দশটার আগে আসতে পারবেন না। খুব-নামকরা কবরেজ। দূর-দূরান্ত থেকে বিলিতি পাস ডাক্তারদের কাছে সর্বস্বান্ত হয়ে কত রোগী ওঁর কাছে এসে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকছে। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী!

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, আচ্ছা কালীপদ, বিজয়গড়ে তো বেশ কিছু খ্রিস্টান আছে?

কালীপদ বলল, তা আছে। ওরা আলাদা পাড়ায় থাকে। ক'ঘর অ্যাংলো সায়েব-মেমও আছে। আদিবাসী খ্রিস্টানের সংখ্যাই বেশি।

তুমি যোশেফ নামে কাকেও চেনো?

আজ্ঞে খুব চিনি। কালীপদ একটু হাসল। বাচ্চুবাবুর সঙ্গে তার ভাব ছিল। মাঝে মাঝে বাচ্চুবাবুর সঙ্গে রাজবাড়িতে আসত। একের নম্বর ফাটকাবাজ। বউয়ের রোজগার খায়। বউ হল গে মিশন ইস্কুলের মাস্টারনী। বাচ্চুবাবু নিখোঁজ হওয়ার পর পুলিস তাকে অ্যারেস্ট [illegible]ছিল। কিন্তু যোশেফের পেছনে নারাণবাবুর পার্টি আছে। নারাণবাবু ভোটে দাঁড়িয়ে হেরে গিয়েছিলেন। তবু হাল ছাড়েননি।

এই সময় গেটের দিকে কেউ ডাকল, কালী! ও কালীপদ!

কালীপদ দেখে বলল, কবরেজমশাই এসেছেন।

শোনো। আমরা একটু বেরুচ্ছি। তুমি দরজায় তালা এঁটে দিয়ো। কেমন?

আজ্ঞে। বলে কালীপদ দৌড়ে গিয়ে গেট খুলতে গেল।

দেখলুম, রোগাটে চেহারার এক ভদ্রলোক সাইকেলে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। কেরিয়ারে একটা মোটাসোটা ব্যাগ। কালীপদ তাঁকে বলল, সোজা ঠাকুরমশাইয়ের ঘরে চলে যান কবরেজমশাই।...

একটু পরে আমরা বেরলুম। ধ্বংসস্তূপের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে মোরাম রাস্তায়, তারপর বড় রাস্তায় গেলুম। একটা খালি সাইকেল রিকশা দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন, খ্রিস্টানপাড়া যাব।

বাঙালি রিকশাওয়ালা বলল, দশ টাকা লাগবে স্যার!

ঠিক আছে। তুমি যোশেফ নামে কাকেও চেনো?

রিকশাওয়ালা হাসল। তাকে বিজয়গড়ে কে চেনে না স্যার? মার্কামারা লোক।

বিজয়গড়ের বাজার পেরিয়ে রিকশা ডানদিকে ঘুরে অলিগলি রাস্তায় চলতে থাকল। কিছুক্ষণ পরে একটা গির্জা বাড়ি দেখতে পেলুম। খ্রিস্টানপাড়া বেশ সাজানো-গোছানো মনে হল। একটা করে ছিমছাম বাড়ি আর সামনে ফুলবাগান। একটা বাড়ির সামনে রিকশা দাঁড়াল। একতলা বাড়িটার গেটে নেমপ্লেট আছে। 'জে ডি'সুজা'। তার তলায় 'এম ডি'সুজা'। কর্নেল বললেন, পর্তুগিজ বংশধর মনে হচ্ছে।

গেটে কলিং বেলের স্যুইচ টিপলেন। একটু পরে একজন ফ্রকপরা আদিবাসী কিশোরী বারান্দায় বেরিয়ে বলল, সাবলোক বাহার গেয়া।

কর্নেল বললেন, মেমসাবকো বোলাও।

কর্নেলের চেহারা দেখে সে সম্ভবত খ্রিস্টান এবং পাদ্রিসায়েব ভেবেছিল।

কারণ কথাটা শুনে সে বুকে ক্রশ এঁকে মাথা একটু ঝাঁকিয়ে বলল, কাঁহাসে আয়া আপলোগ?

দুমকা মিশনসে।

তামাটে রঙের একজন মেমসায়েব পর্দা তুলে দরজায় উঁকি দিচ্ছিল। তার পরনে সোয়েটার এবং স্কার্ট। হাঁটু থেকে মোজা পরা। কর্নেল বললেন, মর্নিং মিসেস ডি'সুজা! আই হ্যাভ কাম টু মিট ইয়োর হাজব্যান্ড মিঃ যোশেফ। আই অ্যাম কর্নেল এন সরকার।

আর ইউ কামিং ফ্রম ডুমকা মিশন?

ইয়া।

মিসেস ডি'সুজা সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, যোশেফ হ্যাজ নাথিং টু ডু উইদ এনি খ্রিস্টিয়ান মিশন।

হি হ্যাজ অ্যাপ্লায়েড ফর এ জব।

ইজ উট? মাই গড! হোয়াই শুড হি ডু দ্যায়? ইউ হ্যাভ কাম টু এ রং ম্যান আই থিংক্!

প্লিজ টেল হিম দ্যাট—

হি ইজ নট অ্যাট হোম নাও। ইউ মে ফাইন্ড আউট হিম ইন দ মার্কেট এরিয়া। বলে মিসেস ডি'সুজা ভেতরে ঢুকে গেলেন।

আদিবাসী কিশোরীটি ঝাঁটা হাতে নীচের ফুলবাগানে নেমে এল। তারপর বলল, ডাব্বুকা চায় দুকানমে দেখিয়ে।

কর্নেল চুপচাপ পা বাড়ালেন। হাঁটতে হাঁটতে বললুম, আইভির এ বাড়িতে থাকার কথা।

কর্নেল বললেন, আছে। ডানদিকের ঘরের জানালার পর্দার ফাঁকে তার নাক দেখলুম!

নাকটা যে আইভির, তা কী করে বুঝলেন?

কর্নেল হাসলেন। 'নাকের আমি নাকের তুমি নাক দিয়ে যায় চেনা'। সুকুমার রায়ের পদ্যে অবশ্য 'গোঁফ' আছে। আসলে পোর্তুগিজ নাক আর ইংলিশ নাকের তফাত আছে। যাই হোক, সেটা অ্যানথ্রোপোলজির আওতায় পড়ে।...

বাজার এলাকায় গিয়ে একে-তাকে জিজ্ঞেস করে ডাব্বুর চায়ের দোকানের খোঁজ পাওয়া গেল। সেখানে একটা মোটর সাইকেলেও দেখলুম। ব্যাগি সোয়েটার আর জিনস পরা এক যুবক মোটর সাইকেলটার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। মাথায় একরাশ বিশৃঙ্খল চুল। কানে রিং। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, সে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান তো বটেই, আমার ধারণা মতে পর্তুগিজ বংশধর। কর্নেল গিয়ে তাকে সম্ভাষণ করলেন, মর্নিং মিঃ যোশেফ।

সে কড়া চোখে তাকাল। ইয়া?

কর্নেল তাকে তাঁর নেমকার্ড দিলেন। সে কার্ডটাতে চোখ বুলিয়ে বলল, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

আই হ্যাভ সামথিং টু নো ফ্রম ইউ।

হোয়াট্টাবাউট দ্যাট?

কর্নেল আস্তে বললেন, অ্যাবাউট ইয়োর ফ্রেন্ড বাচ্চু।

যোশেফ চমকে উঠেছিল। সামলে নিয়ে বলল, ইউ আর আ ন্যাচারালিস্ট। আ রিটায়ার্ড কলোনেল। হোয়াই আর য়ু ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট বাচ্চু?

প্লিজ লেট আস টক সামহোয়্যার প্রাইভেটলি।

যোশেফ সন্দিগ্ধ দৃষ্টে একটুখানি তাকিয়ে থাকার পর বলল, ও কে! কাম উইদ মি।

কর্নেল আমাকে বললেন, তুমি একটু অপেক্ষা করো জয়ন্ত!

যোশেফ কয়েক পা এগিয়ে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় দাঁড়াল। তারপর দু'জনের মধ্যে প্রায় মিনিট দশেক কথাবার্তা হল। লক্ষ্য করলুম, যোশেফকে প্রথমে যতটা উত্তেজিত দেখাচ্ছিল, তা ক্রমশ কমে গেল এবং সে স্বাভাবিক হয়ে গেল।

কর্নেলের সঙ্গে ফিরে এসে সে বলল, ও কে কলোনেল সরকার। দ্য ন্যাস্টি ডগস নো হাউ টু বার্ক। বাট দে ডু নট নো হাউ টু বাইট।

থ্যাঙ্কস যোশেফ! গুড বাই।

বাই!

কর্নেল একটা সাইকেল রিকশা ডেকে বললেন, রাজবাড়ি।

রিকশাতে চেপে বললুম, কী কথা হল?

যথাসময়ে জানতে পারবে। মুখটি বুজে থাকো।...

রাজবাড়িতে ঢুকে দেখি, একটা মোটরগাড়ি বটতলায় দাঁড়িয়ে আছে। কালীপদ বলল, বোসসায়েব এসে গেছেন। রানীমার ঘরে আছেন এখন।

কর্নেল বললেন, দরজা খুলে দাও। ঘরে ঢুকে একটু রেস্ট নিই।

কালীপদ দরজায় তালা এঁটে রেখেছিল। খুলে দিয়ে বলল, বোসসায়েব রানীমাকে বলছিলেন, আপনার নাম ওঁর জানা। উনি বিকেলেই চলে যাবেন। আপনার সঙ্গে আলাপের জন্য ব্যস্ত। তা স্যার, যোশেফের দেখা পেলেন?

হ্যাঁ। কবরেজমশাই কী বলে গেলেন?

ওষুধ দিয়ে গেলেন। ঠাকুরমশাইকে হাঁটাচলা করতে বারণ করলেন।...

একটু পরে কর্নেলের মতো তাগড়াই চেহারার গুঁফো এক ভদ্রলোক এসে নমস্কার করে বললেন, আমার সৌভাগ্য! লেজেন্ডারি ফিগার কর্নেলসায়েবকে চর্মচক্ষে দর্শন করলুম। আমি অরবিন্দ বোস। বর্ধমান রেঞ্জের ডি আই জি।

কর্নেল তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আপনাদের সোর্স থেকে জেনেছেন, বাচ্চুবাবু নাকি আর বেঁচে নেই। সেই সোর্স কতটা বিশ্বাসযোগ্য?

অরবিন্দ বোস বললেন, বিশ্বাসযোগ্য। সে কালীপুজোর পরদিন ভোরবেলায় সাইকেলে চেপে নদীর ওপারে একটা আদিবাসী বস্তিতে মজুর ডাকতে যাচ্ছিল। টমসায়েবের বাংলোর নীচে গিয়ে সে রাস্তার ওপর অনেকটা রক্ত দেখতে পায়। একটা রক্তমাখা চপ্পলও পড়েছিল। কিন্তু সে পুলিসকে ভয়ে কিছু জানায়নি। বুঝতেই পারছেন, সাধারণ মানুষেরা পুলিসকে এমনিতে এড়িয়ে চলে। ফেরার সময় সে রক্ত দেখেছিল। কিন্তু চপ্পলটা ছিল না। সেদিন রাত্রি থেকে আকাশ মেঘলা ছিল। দুপুর নাগাদ বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে রক্তটা ধুয়ে যায়। আমরা টমসায়েবের বাংলোর চৌকিদারকে জেরা করেছিলুম। সে কিছু বলতে পারেনি। সে কালীপুজোর রাত্রে বিজয়গড়ে তার বাড়িতে ছিল। তার প্রমাণ পেয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাচ্চুর বন্ধুদেরও অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও তাদের কাছে কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

কর্নেল বললেন, আপনি নাকি বিকেলে চলে যাচ্ছেন?

আমাকে আসানসোল যেতে হবে। একটা বড় হাঙ্গামা হয়েছে গত রাত্রে। তবে আমি লোকাল পুলিসকে আপনার কথা বলে যাব। সবরকমের সাহায্য আপনি পাবেন।

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, আপনি আজ রাত্রে থাকলে একটা নাটক দেখতে পেতেন।...

।। আট ।।

কর্নেলের কথা শুনে ডি আই জি অরবিন্দ বোস একটু হেসে বললেন, আপনি শিওর যে আজ রাতে একটা নাটক হবে?

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, খানিকটা শিওর। আসলে আজ রাতে আমি একটা ফাঁদ পেতে রাখব ঠিক করেছি। অন্তত নাইনটি নাইট পারসেন্ট চান্স আছে যে, ফাঁদে লোকটা পা দেবে।

লোকটা! বোসসায়েব ভুরু কুঁচকে তাকালেন। কর্নেলসায়েব! আমি হেঁয়ালি পছন্দ করি না।

আপনার থাকার সুযোগ যখন নেই, তখন কথাটা হেঁয়ালি হয়েই থাক। পরে যথাসময়ে জানতে পারবেন।

বোসসায়েব কিছুক্ষণ গোঁফে তা দেওয়ার পর বললেন, আমি দিদার কাছে শুধু এটুকু শুনেছি যে তাঁর জীবন নাকি বিপন্ন। দিদাও খুলে কিছু বলেননি। আমি রাজবাড়িতে পুলিস ক্যাম্প বসাতে চাইলুম। তাতেও তাঁর আপত্তি। যাই হোক। এটা স্পষ্ট, দিদাকে কেউ মার্ডার করতে পারে। হ্যাঁ-- তাঁকে মার্ডার করলে সিংহবাহিনী মেলা কমিটির হাতে রাজবাড়িটা চলে যাবে। বাচ্চুর বাবা তাঁর শেয়ার দাদামশাইয়ের জীবদ্দশায় বেচে টাকা নিয়েছিলেন। এদিকে বাচ্চু বেঁচে নেই। তা হলে আপনার সো-কল্ড্ 'লোকটা' মেলা কমিটির প্রভাবশালী চাঁইদের ভাড়া করা কিলার। এই তো?

কর্নেল হাসলেন। আপনার অঙ্কটা ঠিক হতেই পারে। তবে আপনাকে খবর দিয়ে এখানে আপনার উপস্থিতি চেয়েছিলুম একটা মাত্র কারণে। তা হল, বাচ্চু যে সত্যি খুন হয়েছে, তার সলিড প্রমাণ আপনার হাতে কতটা আছে তা জানা। কিন্তু শুধু জানতে পারলুম, আপনাদের সোর্স টমসায়েবের বাংলোর কাছে রাস্তায় খানিকটা রক্ত আর একপাটি জুতো দেখেছিল। অথচ বাচ্চুর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দূরে কোথাও জঙ্গলের মধ্যে বা পাহাড়ে পুঁজে ফেললে তা খুঁজে পাওয়া সম্
নয়। এই এরিয়ার ভূ-প্রকৃতির যা অবস্থা, তা তো আপনি নিজেও দেখছেন। চি
বলছিলেন, আপনি আগেও এসেছেন। অবস্থা তত কিছু বদলায়নি। তবু পুলিসের প
থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয়নি।

আচ্ছা মিঃ বোস, টমসায়েবের মেয়ে আইভির সঙ্গে বাচ্চুর নাকি মেলামেশা ছি
আইভিকে নিশ্চয় পুলিস জেরা করেছে?

অরবিন্দ বোস গম্ভীর মুখে বললেন, সেই মেয়েটাই তো বাচ্চুর সর্বনাশের কার
তার দাদা জন তাকে চিত্তরঞ্জন টাউনশিপে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে দাদার অম
মেয়েটা একজন দেশী খ্রিস্টানকে বিয়ে করেছিল। সেই লোকটা আবার চো
জোচ্চোর টাইপ। অফিসের টাকা চুরি করে ফেরার হয়েছে। ওদের দু'জনের নাে
হুলিয়া জারি করা হয়েছে।

তা হলে আইভিকে জেরা করার সুযোগ পাওয়া যায়নি?

নাহ্। আইভিকে পেলে কিছু ক্লু বেরিয়ে আসত। এমনকি আমার স
আইভিকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে বাচ্চুকে মারা হয়েছে। আপনাকে খুলেই বল
কালীপুজোর দিন বিকেলে আইভি তার বাবার বাংলোয় এসেছিল। একটা ঘোড়
গাড়ি ভাড়া করে সে এসেছিল। সেই গাড়ির মালিক লাল্লুমিয়া নিজেই পুলিস
কথাটা জানিয়েছিল। তারপর আইভির নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়।

বিজয়গড়ে মুসলিম মহল্লা আছে! আপনার কথা শুনে মনে পড়ল।

আছে। এখান থেকে কাছেই। বিজয়গড়ে ঢোকার মুখে বাঁদিকে দেখতে পাবে

কর্নেল বললেন, শর্টকাটে রাজবাড়ির দক্ষিণ দিক থেকে যাওয়া যায়। তাই না
বোস?

হ্যাঁ। তবে ওদিকে গেলে মুসলিম গোরস্তান পড়বে।

দেখাল। বললেন, গোরস্তানটা আমি দেখেছি। আট ব
আগের কথা। ওখানে এক ঝাঁক লাল ঘুঘু দেখেছিলুম।

এতক্ষণে ডি আই জি সায়েবের মুখে হাসি ফুটল। বললেন, আপনার কিছু হ
কথা শুনেছি।

হ্যাঁ। লাল ঘুঘু এখন প্রায় বিরল প্রজাতির পাখি বলা চলে। ওরা দল বেঁধে থা
বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।

ভাবলুম, হয়তো এখনই বাইনোকুলার নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। কিন্তু তারপর ি
বসালেন। চাপা স্বরে বললেন, মিঃ বোস! আপনি একটা ইনফরমেশন সংগ্রহের ব্য
করে যেতে পারবেন?

বলুন!

কালীপুজোর দিন মুসলিম মহল্লার কেউ মারা গিয়েছিল কি না। মারা গিয়ে াকলে তার কবর কোনটা। আপনি লোকাল থানার কোনও অফিসার পাঠিয়ে থাটা জেনে নিতে পারেন।

অরবিন্দ বোস আবার কর্নেলের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন। তারপর একটু হুসে সোয়েটারের ভেতর হাত ভরে একটা সেলুলার ফোন বের করলেন। অ্যান্টেনা ঃনে উনি পশ্চিমের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ফোনের বোতাম টিপে একটু রে চাপা গলায় কথা বলতে থাকলেন। তারপর হাতের ঘড়ি দেখে একটু জোরে ললেন, আই অ্যাম স্টার্টিং অ্যাট টু ও'ক্লক শার্প। ... ও কে। থ্যাঙ্কস।...

অ্যান্টেনা ফোনে ঢুকিয়ে ফোনটা আবার সোয়েটারের ভেতর চালান করে াসসায়েব বললেন, আমার গাড়িতে রেডিও ট্রান্সমিশনের ব্যবস্থা আছে। তবে এই র্ডলেস ফোনটা তিন কিলোমিটারের মধ্যে ব্যবহার করা যায়। দেশটা তো এখনও ামেরিকা হয়ে ওঠেনি। এনিওয়ে, আপনার উদ্দেশ্যটা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট য় কর্নেলসায়েব।

কর্নেল বললেন, একটা চান্স নিচ্ছি মাত্র।

অরবিন্দ বোস হঠাৎ নড়ে বসলেন। মাই গড! আপনি কি ভাবছেন--

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিলেন। জাস্ট এ চান্স! শুধু ইনফরমেশনটা পেলেই যথেষ্ট।

মে বি ইউ আর রাইট।

যদি আমার অঙ্কটা মিলে যায়, তা হলে অগত্যা আমাকে আজ রাত্রে নয়, াগামীকাল রাত্রে ফাঁদটা পাততে হবে।

ডি আই জি সায়েব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, দিদার কাছে যাই। তো যদি আপনি ামাকে আগামীকাল রাত্রে পেতে চান, কালীকে থানায় পাঠিয়ে আমার বাড়িতে মসেজ দিতে বলবেন। মেসেজ না পেলে আমি কিন্তু আসছি না। আই হ্যাভ লট অব ংিস টু ডু ইউ নো!

উনি বেরিয়ে যাওয়ার পর বললুম, ভদ্রলোক একটু গোঁয়ার টাইপ। এমন টোনে াপনার সঙ্গে আজ পর্যন্ত কোনও মহারথীকে কথা বলতে শুনিনি। সি বি আইয়ের ডরেক্টর পর্যন্ত আপনাকে সম্মান করেন।

কর্নেল হাসলেন। না, না! উনি আমাকে অসম্মান করেননি। আসলে উনি াইছিলেন, তুরুপের তাসটা ওঁকে যেন দেখাই। এটা মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল য়ন্ত!

কিন্তু হঠাৎ কবর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন?

চেপে যাও। স্পিকটি নট।

কিছুক্ষণ পরে কালীপদ এসে বলল, স্নানের জল গরম করা হয়েছে স্যার!

কর্নেল বললেন, আজ আমি স্নান করছি না। জয়ন্ত করবে।

বললুম, নাহ্। ইচ্ছে করছে না।

কালীপদ হাসতে হাসতে বলল, তা হলে জলটা আমার ভোগে লাগুক। বোসসায়েবও স্নান করবেন না। ওঁর ড্রাইভার চান করতে চায় তো ঠাণ্ডা জলেই করুক।...

আজ খেতে একটা বেজে গেল। বোসসায়েব রানীমার সঙ্গেই বেশি কথা বললেন। মেলা কমিটিতে যত প্রভাবশালী লোকই থাক, রাজবাড়ি উনি তাদের হাত থেকে বাঁচাবেন। বরং বাড়িটা ওঁর দিদা যদি উইল করে সরকারকে দানের ব্যবস্থা করেন, এটা একটা কলেজ হতে পারে। রানীমা সকৌতুকে বললেন, সবাই আমার মৃত্যুর দিন গুনছে। দেখলেন তো কর্নেলসায়েব!

খাওয়ার পর বেসিনে হাত ধুয়ে বোসসায়েব বারান্দায় গেছেন, সেই সময় পিঁ পিঁ শব্দ কানে এল। উনি সোয়েটারের ভেতর হাত ভরে সেলুলার ফোন বের করে অ্যান্টেনা টেনে সাড়া দিলেন। দেখলুম, রানীমা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।

কর্নেল বললেন, চলো জয়ন্ত! চুরুট টানার আগে কোনও কথা নয়।

আমরা ঘরে ঢুকেছি, এমন সময় ফোন কানের কাছে রেখেই বোসসায়েব এলেন। ক্রমাগত উনি ইয়া, হুঁ, ও কে ইত্যাদি বলে যাচ্ছিলেন। কর্নেল চুরুট ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন। বোসসায়েব ফোনটা সোয়েটারের ভেতর ঢুকিয়ে কর্নেলের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, ইউ আর রাইট কর্নেলসায়েব। এস আই রামশরণ শর্মাকে ওরা কবরটা দেখিয়ে দিয়েছে। ওরা ভিড় করে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল। শর্মা ওদের প্রশ্নের জবাব দেয়নি। বাট দে উইল নট অ্যালাউ এনিবডি টু--

কর্নেল দ্রুত বললেন, দ্যাট আই নো মিঃ বোস!

দেখবেন মশাই, যেন হাঙ্গামা না বাধে! বলে ডি আই জি বেরিয়ে গেলেন।...

অভ্যাসমতো ভাতঘুম দিতে গিয়ে কালকের মতোই পুরো ঘুমের কবলে পড়েছিলুম। কালীপদর ডাকে চারটেয় উঠে বসতে হল। কালীপদ চা দিয়ে বলল, কর্নেলসায়েব বেরিয়েছেন।

বোসসায়েব?

উনি দুটোর সময় চলে গেছেন। রানীমা এত করে বললেন, থাকলেন না। আসানসোলে কী কাজ আছে। বোসসায়েব বড় একগুঁয়ে মানুষ।

পাঁচটা বাজতে না বাজতে রাজবাড়িতে আলো জ্বলে উঠল। তার একটু পরে কর্নেল ফিরে এলেন। কালীপদ ওঁর জন্য কফির ব্যবস্থা করতে গেল। বললুম, কোথায় গিয়েছিলেন আজ?

লাল ঘুঘুর ঝাঁক দেখতে।

মুসলিম কবরখানায় নাকি?

হ্যাঁ।

তারপর?

তারপর আবার কী?

সেই কবরটা দেখে এসেছেন কি না বলুন?

কর্নেল হাসলেন। এস আই রামশরণ শর্মা বুদ্ধিমান! মাটির কবরটার কাছে খেলার ছলে গাছের পাতা ছিঁড়ে ছড়িয়ে রেখেছিলেন। যাই হোক, কাছাকাছি একটা ঝোপের ভেতর একপাটি চপ্পল পেয়েছি। সেটা কিটব্যাগে প্লাস্টিকের মোড়কে আছে। মজাটা হল, চপ্পলটার পেছনে স্ট্র্যাপ মজবুত। তাই পা থেকে খুলে যায়নি অন্য পাটির মতো।

হাঁ করে তাকিয়ে ছিলুম। এবার বললুম, বুঝে গেছি। বাচ্চুবাবুর ডেডবডি—

চুপ!

কালীপদ এসে বলল, কফি রেডি ছিল। জয়ন্তবাবু চা খেয়েছেন। এবার কফি খান। পাঁপরভাজা এনেছি।

জিজ্ঞেস করলুম, ভটচাযমশাইয়ের কী অবস্থা?

দুপুরে দেখলুম, কাঁচকলা সেদ্ধ দিয়ে ভাত খাচ্ছেন। লেবু চাইলেন। গাছ থেকে পেড়ে দিয়ে এলুম। তবে চেহারা দেখে মনে হল, একটু সুস্থ হয়েছেন। এ বেলা উপোস করবেন বলছিলেন।

কালীপদ চলে যাচ্ছিল। কর্নেল তাকে ডাকলেন। কালীপদ! শোনো।

বলুন স্যার?

তোমার কি মনে আছে বাচ্চুবাবু কেমন জুতো পছন্দ করত?

কালীপদ অবাক হয়ে বলল, কেন স্যার?

এমনি জিজ্ঞেস করছি।

স্যান্ডেল বা চপ্পল পরতেন। কখনও পামসু বা বুট পরতে দেখিনি।

পেছনে স্ট্র্যাপ দেওয়া চপ্পল?

আজ্ঞে। ওঁর ঘরেই তো কত নমুনা আছে। লক্ষ্য করেননি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। লক্ষ্য করেছিলুম। ঠিক আছে।

কালীপদ সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে চলে গেল। বললুম, ছ্যা ছ্যা! ওই জুতো আপনি কিটব্যাগে ভরে রেখেছেন?

রক্তের ছিটে কোথাও আছে কি না পরীক্ষা করতে হবে। হয়তো বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। রক্তের ছিটে কালো হয়ে গেছে। তবু চেষ্টা করব। তারপর ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

একটু ভেবে নিয়ে বললুম, টমসায়েবের বাংলো থেকে কবরখানা তো বেশ দূরে।

বাচ্চুর লাশ বয়ে আনা এবং টাটকা কবরে ঢোকানো কষ্টসাধ্য কাজ। একজনের পক্ষে কি সম্ভব?

কর্নেল দাড়ি থেকে কী একটা ফেলে দিয়ে বললেন, নাহ্। অন্তত দু'জন লোক দরকার। খুনীর সঙ্গী ছিল। একজন হতে পারে। দু'জনও হতে পারে।

এই সময় বাইরে দূরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। কর্নেল উঠে গিয়ে উত্তরের একটা জানালা খুললেন। তারপর জানালাটা বন্ধ করে বললেন, মোটর সাইকেলের শব্দ। সম্ভবত যোশেফ আইভিকে নিয়ে সারেংডির বাংলোয় গেল।

বললুম, আপনি যাবেন না?

নাহ্। যোশেফকে বলা আছে, হালদারমশাইকেও মোটর সাইকেলের পেছনে চাপিয়ে রাজবাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে যাবে। ওর মোটর সাইকেলে ডাবল কেরিয়ার আছে। একাধিক সঙ্গী নিয়ে ঘোরে কি না!

রানীমাকে তা হলে বলে রাখা উচিত।

ব্যস্ততার কিছু নেই। সময়মতো বলব, আমার একজন গেস্ট আসার কথা। তবে রাতের খাওয়া হালদারমশাই ওখানেই খেয়ে নেবেন। যোশেফকে বলে দিয়েছি।...

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো! রানীমাকে কথাটা এবার বলে আসি। কালীপদ দেখছি এ ঘরের তালাচাবি টেবিলে রেখেছে। তালা এঁটেই বেরুব।

বললুম, আমি গিয়ে কী করব? নড়তে ইচ্ছে করছে না।

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, একা থাকলে কাল সন্ধ্যার মতো ভয় পেয়ে ফায়ার আর্মস বের করবে। কী দেখতে কী দেখে হয়তো গুলি ছুড়ে বসবে। আমি রিস্ক নিতে চাই না। তুমি মিথ্যা একটা সিন ক্রিয়েট করো।

ওঁর কথায় একটু চটে গিয়ে বললুম, কাল সন্ধ্যায় আমি ভূত না দেখলেও মানুষ দেখেছিলুম, সেটা তো সত্যি। মানুষটা যে ভটচাযমশাই, তা-ও সত্যি। উনি না হয়ে রানীমার শত্রুপক্ষের কেউ ওভাবে চুপি চুপি ফুলবাগানে ঘাপটি পেতে থাকতেও পারত। কাজেই আমি সিন ক্রিয়েট করতে বাধ্য হয়েছিলুম।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, নাহ্। রানীমার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা জানতে যাচ্ছি। তুমিও স্বকর্ণে শুনলে মাথা পরিষ্কার হবে। রহস্যের একটা জট খুলে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

তালা এঁটে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ফুলবাগানের ওদিকটা দেখতে দেখতে গেলুম। আলোর সীমানা শেষে বাউন্ডারি ওয়াল অব্দি আবছা আঁধার। কর্নেল যা-ই বলুন, আমার মনে হচ্ছিল কেউ বা কারা ওখানে ঘাপটি পেতে বসে গোপন চক্রান্ত করছে।

ডাইনিং রুমের সামনে কালীপদ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কর্নেল তাকে বললেন, কালীপদ!

ীমার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

কালীপদ বলল, রানীমা আপনাকে ডেকেছেন। আপনাদের দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে লুম। যান। উনি অপেক্ষা করছেন।

রানীমার ঘরের পর্দা সরানো। উনি ইজিচেয়ারে শাল মুড়ি দিয়ে বসেছিলেন। মাদের দেখে বললেন, বসুন!

আমরা বসলুম। তারপর কর্নেল বললেন, আগে আমার কথাটা বলে নিই। আমার ক বন্ধু সারেংডি ফরেস্টে বেড়াতে এসেছেন। ফরেস্ট বাংলোয় তিনি উঠেছিলেন। ন্তু বাংলোর অবস্থা খুব খারাপ। তাই উনি আজ রাত্রেই চলে আসতে চান। মাদের ঘরে অন্তত একটা খাটিয়া হলেই ওঁর থাকার ব্যবস্থা করা যায়। আপনার নুমতি পেলে---

রানীমা দ্রুত বললেন, কোনও অসুবিধে নেই। পাশের ঘরেও উনি থাকতে রেন।

কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, তা হলে খুলেই বলি। তিনি একজন প্রাক্তন পুলিস ফিসার। এখন প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন কলকাতায়। নাম মিঃ কে কে লদার। ওঁকে আমার কাজের সুবিধার জন্যই আসতে বলেছিলুম।

রানীমা সোজা হয়ে বসলেন। তা হলে ওঁকে জঙ্গলে ফেলে রেখেছেন কেন? এটা চিত হয়নি।

ওঁকে বাইরে রাখার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে আপনার শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে উনি জ করতে পারেন।

রানীমা একটু হেসে বললেন, কথাটা শুনে ভাল লাগল। আমি জানতুম, আপনি কটা হেস্তনেস্ত না করে যাবেন না। তো কালীকে ওঁর জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করতে লি।

না। উনি খেয়ে আসবেন। বলে কর্নেল হঠাৎ উঠে দরজার উঁকি মেরে বাইরেটা খে নিলেন। তারপর বললেন, আপনার বলার কথা পরে শুনছি। আগে আমার এই শ্নটার উত্তর দিন। প্রশ্নটা এখানে এসেই করা উচিত ছিল। কিন্তু তখন আমি একটু ভ্রান্ত ছিলুম। যাই হোক, আমার জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি বাচ্চুবাবুকে সিন্দুকের ক নম্বর চাবি কী ভাবে দিয়েছিলেন? শুধুই কি চাবিটা দিয়েছিলেন? নাকি চাবিটা কানও জিনিসের ভেতর লুকনো ছিল?

রানীমা বললেন, ঠিক এই কথাটা বলার জন্যই আপনাকে ডেকেছি। স্যাকরা তকে একটা সোনার চেন এবং একটা মোটা লকেট তৈরি করিয়েছিলুম। লকেটের ভতরটা ছিল খালি। একটু অড সাইজ। একটা দিকে জোরে চাপ দিলে খোলা যায়। ার ভেতর সিন্দুকের এক নম্বর চাবি ছিল। চাবিটা এক ইঞ্চি লম্বা। পেতলের চাবি।

দেখাচ্ছি।

বলে তিনি পেটের কাছ থেকে খুদে ব্যাগ বের করে দ্বিতীয় চাবিটা দেখালেন।

কর্নেল বললেন, এবার আমার কাছে সব রহস্য ফাঁস হয়ে গেল। এরপর কী করণীয়, কাল আপনার সঙ্গে আলোচনা করব।...

।। নয় ।।

হালদারমশাই এসে পৌঁছেছিলেন রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ। আমাকে ঘরেই একটা ক্যাম্প খাটে ওঁর বিছানার ব্যবস্থা করে রেখেছিল কালীপদ। তিনি খেয়ে এসেছিলেন। শুধু এক কাপ কফি খেতে চাইলেন। কালীপদ শিগগির কফি দিয়ে গেল।

কফি খেতে খেতে উনি যা বললেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই--

আইভি চিত্তরঞ্জন টাউনশিপে গিয়ে জেমস বিশ্বাসকে বিয়ে করার পর গোপনে বাচ্চুর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রেখেছিল। সে সুযোগ পেলেই বাবার বাংলোতে চলে আসত। বাচ্চু সেখানে যেত। আইভির বন্ধুর যোশেফ ছিল বাচ্চুরও বন্ধু। আইভি গেলে যোশেফকে দিয়ে খবর পাঠাত। কালীপুজোর রাতেও তা-ই করেছিল সে। বাচ্চু রাত দশটা নাগাদ বাংলোতে গিয়েছিল। সে সঙ্গে হুইস্কি আর ওয়াইন নিয়ে গিয়েছিল অন্য রাতের মত। বাচ্চু সে রাত্রে খুব মাতাল হয়ে পড়েছিল। তার গলার লকেটটা অনেকে বরাবর দেখেছে। বাচ্চুকে উপহার হিসেবে চেয়েছে। বাচ্চু দেয়নি। সে রাত্রে আইভি লোভ সামলাতে পারেনি। মাতাল বাচ্চুর গলা থেকে খুলে নিয়ে নিজের গলায় পরেছিল। রাত একটা নাগাদ হঠাৎ সেখানে কেউ বাচ্চুকে ডাকাডাকি করে। বাংলোতে বিদ্যুৎ নেই। আইভি বাচ্চুকে ঘুম থেকে জোর করে ওঠায়। লোকটা গেটের কাছে ক্রমাগত ডাকছিল। বাচ্চু শোনামাত্র কেন কে জানে রেগে যায় এবং গাল দিতে দিতে বেরিয়ে লোকটাকে তাড়া করে। স্বভাবত আইভি ভয় পেয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু বাচ্চু আর ফিরে আসেনি। আইভি পরদিন বেলা ন'টা অব্দি অপেক্ষা করে শর্টকাটে হাঁটতে হাঁটতে বিজয়গড়ের মোড়ে যায়। তারপর বাসে চেপে ফিরে যায় চিত্তরঞ্জন টাউনশিপে। কয়েকদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় সে একটা বাড়িতে প্রাইভেট পড়িয়ে আসছে, আচমকা একটা লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে বলে, কথা আছে। বলেই সে তার গলার দিকে হাত বাড়ায়। আইভি চেঁচিয়ে ওঠে এবং ছুটে পালায়। লোকটাকে সে বিজয়গড়ে থাকার সময় দেখেছিল। তার পরিচয় জানে না। এ ঘটনা শুধু একবার নয়, পর-পর তিনবার ঘটেছিল। ভয়ে সে লকেটটা লুকিয়ে

ফেলেছিল। ইতিমধ্যে একদিন যোশেফ গিয়ে তাকে খবর দেয়, বাচ্চু নিখোঁজ হয়েছে। পুলিস আইভিকেও অ্যারেস্ট করতে পারে। আইভি দাদার কাছে ক্ষমা চেয়ে তার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তার কিছুদিন পরে জেমস অফিসের ক্যাশ হাতিয়েছিল। সে আইভিকে গোপনে ডেকে কলকাতা পালানোর প্ল্যান করে। তারপর যা ঘটেছে, আমাদের জানা। লোকটা-- 'দ্যাট স্কাউন্ড্রেল' কী করে যে আইভি আর জেমসের কলকাতা পালানো টের পেয়েছিল, এটাই আশ্চর্য!

সব কথার শোনার পর কর্নেল বললেন, এমন হতে পারে লোকটাও কলকাতা যাচ্ছিল একই ট্রেনে। দৈবাৎ আইভিদের দেখতে পেয়ে ফলো করেছিল।

বললুম, দৈবাৎ, নাকি সে চরের সাহায্যে নজর রেখেছিল ওদের ওপর?

হালদারমশাই নস্যি নিয়ে বললেন, বুঝি না।

কর্নেল বললেন, আমার অঙ্ক কষা হয়ে গেছে। লোকটা নিজেই চিত্তরঞ্জনে গিয়ে ওত পেতে ছিল। পরেরটুকু দৈবাৎ।

বললুম, দৈবাৎ ব্যাপারটা আকস্মিকতা। অঙ্কে আকস্মিকতার প্রশ্ন ওঠে না।

কর্নেল হাসলেন। আকস্মিকতার পেছনেও গণিতের সূত্র কাজ করে জয়ন্ত! ধরো, গাছ থেকে একটা ফল পড়ল তোমার সামনে। আপাতদৃষ্টে এটা আকস্মিক। কিন্তু ফলটা খসে পড়ার পেছনে প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করছে। ফলটার বোঁটা সেই নিয়মে একটু-একটু করে শুকিয়েছে। ওদিকে তুমিও সেখানে উপস্থিত হয়েছ জীবনেরই অলঙ্ঘনীয় নিয়মে। তুমি কোথাও কোনও কাজে যাচ্ছিলে। অথবা সেখানে গিয়ে কোনও উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ছিলে। তোমার কোথাও উপস্থিতির পেছনে জীবনেরই নিয়ম কাজ করে। আকস্মিকতার হাত থেকে ত্রাণ নেই।

এতক্ষণে কালীপদ এসে বলল, চলুন স্যার! খাওয়া রেডি। রানীমা আজ সকাল-সকাল শুয়ে পড়েছেন। রান্না হয়ে গেছে কখন। আমারই আসতে একটু দেরি হল।

কর্নেল বললেন, রানীমার শরীর খারাপ নাকি?

আজ্ঞে না। কোনও-কোনওদিন দশটার আগেই শুয়ে পড়েন।

তোমার আসতে দেরি হল কেন?

আর বলবেন না। ঠাকুরমশাইয়ের আবার পেটের গণ্ডগোল। খিড়কির দরজা খুলে পাহারা দিতে হল। তা না হলে আবার আমার সিডবেড নষ্ট করে দিতেন।

খেয়ে আসার পর কর্নেল বলেছিলেন, আজ রাত্রে আর কোনও আলোচনা নয়। হালদারমশাইয়ের খুব ধকল গেছে। শুয়ে পড়ুন। আমিও শুয়ে পড়তে চাই।...

পরদিন ঘুম ভাঙার পর দেখলুম, হালদারমশাই লনে দাঁড়িয়ে চায়ের কাপ হাতে রাজবাড়ি দর্শন করছেন। কর্নেল প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। সাড়ে সাতটা বাজে। কিন্তু তখনও কুয়াশার পর্দা দুলছে ইতস্তত। কালীপদর স্ত্রী জবা আমার জন্য চা আনল। সে

মৃদুস্বরে বলল, টুকুনের বাবা বাজারে গেছে। গত রাত্তিরে এক কাণ্ড। রানীমা আপনাদের জাগাতে বারণ করেছিলেন।

জিজ্ঞেস করলুম, কী কাণ্ড?

জবা ঘোমটার ভেতর বলল, কে রানীমার দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। উনি স্যুইচ টিপে বেল বাজিয়েছিলেন। টুকুনের বাবা জেগে গিয়েছিল। বল্লম আর টর্চ নিয়ে সারা বাড়ি খুঁজে কাউকে সে দেখতে পায়নি। শত্তুরদের সাহস কত বেড়ে গেছে দেখুন। আপনারা থাকতেও গেরাহ্যি করছে না।

হালদারমশাই কান খাড়া করে শুনছিলেন। মাথায় হনুমান টুপিটি নেই। বললেন, আমাগো ডাকলেন না ক্যান? খুলি উড়াইয়া দিতাম হালার!

জবা চুপচাপ চলে গেল। বললুম, রানীমাকে দেখেছেন হালদারমশাই?

দেখছি। মন্দিরে পূজারতি হয়। ঘণ্টা শুনছিলাম। তারপর দেখলাম এক বৃদ্ধা ছড়ি হাতে আইতাছেন। কালীপদ কইল, উনি রানীমা। বয়স নাকি আশি বৎসর। বিশ্বাস হয় না।

কালীপদ এল ঘণ্টাটাক পরে। আমাকে দেখে সে বলল, কাল রাত্তিরে এক কাণ্ড।

তার কথার ওপর বললুম, শুনেছি। জবা বলছিল।

কালীপদ চাপা স্বরে বলল, আজও উড়ো চিঠি। এটাই শেষ চিঠি বলে লিখেছে।

বলেই সে ফুলবাগানের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, এই! এই ঠাকুরমশাই! আবার?

দেখলুম, ভটচাযমশাই গাড়ু হাতে বাউন্ডারি ওয়ালের পাশে ঝোপের আড়াল দিয়ে হন্তদন্ত চলে যাচ্ছেন। কালীপদ চ্যাঁচামেচি করছিল। রানীমার ধমকে সে থেমে গেল।

হালদারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

তাঁকে ভটচাযমশাইয়ের আমাশার কথা সবিস্তারে বলতে হল। তিনি নস্যি নিয়ে খিক খিক করে হেসে অস্থির হলেন।

কর্নেল ফিরে এলেন এতক্ষণে। কিন্তু উনি ঘরে না ঢুকে সোজা এগিয়ে গেলেন। বুঝলুম রানীমার কাছে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে কালীপদ আমাদের ব্রেকফাস্টের জন্য ডেকে নিয়ে গেল। ডাইনিং রুমে রানীমা ও কর্নেল বসেছিলেন। হালদারমশাইয়ের সঙ্গে তিনি রানীমার আলাপ করিয়ে দিলেন। হালদারমশাই ঢ্যাঙা মানুষ। কুঁজো হয়ে নমস্কার করে বললেন, আমার বড় সৌভাইগ্য! যদি আপনার কাজে লাগতে পারি, আরও সৌভাইগ্য!

ব্রেকফাস্টের পর রানীমা একটু দ্বিধার সঙ্গে কর্নেলকে বললেন, আপনার কথামতো কাজ করতে আপত্তি নেই। কিন্তু শেষ রক্ষা হবে তো?

কর্নেল বললেন, হবে। জানোয়ার ফাঁদে পা দিতে বাধ্য। সে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

তা হলে আপনি আমার ঘরে আসুন। জয়ন্ত আর মিঃ হালদার তাঁদের ঘরে গিয়ে গল্প করুন ততক্ষণ।

আমি ও হালদারমশাই কর্নেলের ইঙ্গিতে চলে এলুম। আমাদের ঘরের সামনে এসে গোয়েন্দাপ্রবর চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কর্নেল স্যার ফান্দ কইলেন ক্যান?

বললুম, আমি এ বিষয়ে একেবারে অন্ধকারে আছি হালদারমশাই!

হালদারমশাই গম্ভীর মুখে বসে নস্যি নিলেন।...

এদিন দুপুরে খাওয়ার পর কর্নেল বেরিয়েছিলেন। হালদারমশাই কালীপদকে ডেকে রাজবাড়ি পরিদর্শনে বেরুলেন। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। চারটে নাগাদ কালীপদ যথারীতি চায়ের কাপ এনে আমার ঘুম ভাঙাল। বললুম, হালদারমশাই কোথায় গেলেন?

কালীপদ হাসল। ওঁকে রাজবাড়ির সব ঘর দেখালুম। শুধু নীচের তলার একটা ঘর দেখানো হল না। ওই ঘরে অনেক ছবি আর নানারকম মূর্তি আছে। ঘরটার চাবি রানীমার কাছে আছে। হালদারসায়েব ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে মন্দিরে সিংহবাহিনী দর্শন করলেন। এখন বোধ করি রাজবাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কথা বলতে বলতে হালদারমশাই এসে গেলেন। কালীপদ তাঁর জন্য চা আনতে গেল। গোয়েন্দা মশাই বললেন, ভাবা যায় না কী ঐশ্বর্য ছিল এই বাড়িতে। এখনও যেটুকু দ্যাখলাম, তাতেই মনে হইল জাদুঘরে ঢুকছিলাম।

কথাটা বলে উনি হঠাৎ ফিস ফিস করলেন, কালীপদ ট্যার পায় নাই। একখান ঘরের চাবি রানীমার কাছে থাকে। সেই ঘরের তালা ভাঙা। একটু টান দিছি আর বুঝছি। কালীপদরে কই নাই। কর্নেল স্যারেরে জানানো দরকার। আমার চোখ জয়ন্তবাবু। চৌতিরিশ বৎসর পুলিসে চাকরি করছি।

চমকে উঠে বললুম, হয়তো ওটাই কর্নেলের ফাঁদ।

গোয়েন্দাপ্রবর গম্ভীর মুখে বললেন, হঃ। ফান্দ্ হইতেও পারে।

কর্নেল ফিরলেন সন্ধ্যার পর। হালদারমশাইয়ের মুখে কথাটা শুনে তিনি শুধু বললেন, জানি।

কালীপদ একটু পরে তিনজনের জন্য ট্রেতে কফি আর স্ন্যাক্স রেখে চলে গেল। কফি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলুম, বোসসায়েব তো এলেন না?

কর্নেল বললেন, এসে গেছেন। যথাসময়ে দিদার বাড়ি আসবেন।

এ রাতে আমরা খেতে গিয়ে রানীমাকে দেখতে পেলুম না। উনি আজ রাতেও সকাল-সকাল শুয়ে পড়েছেন। বাড়িটা আজ যেন বড় বেশি স্তব্ধ। খেয়ে আসার পর কর্নেল বললেন, শুয়ে পড়া যাক।

বললুম, ফাঁদের কথা বলছিলেন। কী হল?

ওয়েট অ্যান্ড সি। বলে কর্নেল বিছানায় শুয়ে মশারির বাইরে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে টেবিল ল্যাম্পটা নিভে গেল। অমনি কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, জয়ন্ত! হালদারমশাই! সময় হয়েছে। উঠে পড়ুন। আর্মস সঙ্গে রাখতে হবে। টর্চ নিন। কিন্তু জ্বালবেন না।

কর্নেল বারান্দার দিকের দরজা খুললেন না। পাশের ঘরের দরজা নিঃশব্দে খুলে সেই ঘরে ঢুকলেন। উনি পায়ের কাছে টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেলেন। তার পরের ঘরের ছিটকিনিও খুলে সন্তর্পণে এগোলেন। বুঝতে পারলুম, বাইরে বারান্দার দিকে তালা আঁটা থাকলেও এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে অসুবিধে নেই। আর একটা ঘরের পর সেই হলঘরে গেলুম। হলঘরের পরের ঘর পেরিয়ে আসবাবপত্র ভরা একটা ঘর। সেখানে ঢুকেই সামনে কোথাও চাপা ঘষ ঘষ শব্দ শুনতে পেলুম। কর্নেলের টর্চ নিভে গেল। একটু পরে কর্নেল ফিস ফিস করে বললেন, আমাকে ছুঁয়ে আসুন আপনারা। ওয়ান বাই ওয়ান।

কর্নেলকে ছুঁয়ে হালদারমশাই এবং তাঁকে ছুঁয়ে আমি নিঃশব্দে এগিয়ে গেলুম। আশ্চর্য! সামনের ঘরের দরজা খোলা। বারান্দার দিকের দরজাও খোলা। অন্ধকার গাঢ় হলেও ক্রমশ দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ একটা জায়গায় আলোর আভাস দেখলুম। ঘরের কোণে মেঝের একটা চৌকো অংশ থেকে আলোর ছটা কাঁপছে। একটু এগিয়ে বুঝতে পারলুম, বেসমেন্ট বা পাতালঘরে নামবার মুখ ওটা। পাতালঘরে কেউ আলো জ্বেলেছে। তিনজনে গুঁড়ি মেরে উঁকি দিলুম। নীচে একটা মোমবাতি জ্বলছে। অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। কর্নেল ফিস ফিস করে বললেন, ফলো মি।

তারপর উনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েই টর্চ জ্বেলে চেঁচিয়ে উঠলেন, গুলি করতে বাধ্য হব। ওটা ফেলে দাও।

হালদারমশাই কর্নেলের পাশ দিয়ে ঝাঁপ দিলেন। ততক্ষণে আমিও নেমে গেছি। এক জটাজুটধারী দাড়িগোঁফওয়ালা লাল কাপড় পরা সাধুর হাতে একটা ধারালো খাঁড়া এবং একটা কারুকার্যখচিত কালো সিন্দুকের ডালা খোলা। নীচে একটা বস্তা পড়ে আছে। হালদারমশাই খাঁড়ার কোপ এড়িয়ে যেভাবে সাধুকে পেছন থেকে জাপটে ধরলেন, তা শুধু সিনেমায় দেখা যায়। সাধু মুখ থুবড়ে পড়ল। খাঁড়াটা সিন্দুকের ওপর সশব্দে ছিটকে গেল। হালদারমশাই সাধুর পিঠে হাঁটুর চাপ দিতেই ককিয়ে উঠল। কর্নেল গিয়ে তার জটাজুট সমেত দাড়িগোঁফে টান দিলেন। সেগুলো উপড়ে গেল। অমনি হতবাক হয়ে দেখলুম, সাধু আর কেউ নয়, স্বয়ং ভটচাযমশাই!

কর্নেল বললেন, হরেকেষ্টকে দাঁড় করান হালদারমশাই।

সিঁড়ির ওপর থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে কেউ বলল, ওকে ওই অবস্থায় রাখুন আপনারা। দিদাকে ডেকে আনি।

বুঝলুম, ডি আই জি অরবিন্দ বোস এসে গেছেন।

ইত্যবসরে দু'জন পুলিস অফিসার নেমে এলেন। কর্নেল সিন্দুকের ডালা দ্রুত এঁটে দিয়েছেন ততক্ষণে। দুটো চাবি একটা গোল রুপোলি চাকার দু'দিকে ঢোকানো ছিল। পরপর ঘুরিয়ে প্রথমে একটা এবং পরে আর একটা চাবি টেনে বের করে পকেটে রাখলেন কর্নেল। খাঁড়াটা আমি কুড়িয়ে নিলুম। সাংঘাতিক ধারালো খাঁড়া।

তারপর রানীমার কান্নাজড়ানো কণ্ঠস্বর ওপরে শোনা গেল। ওরে হরেকেষ্ট! তোর পেটে এত ছিল? দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছিলুম রে!

অরবিন্দ বোস তাঁর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নিয়ে এলেন। কর্নেল চাবি দুটো রানীমার হাতে দিয়ে বললেন, আমার দায়িত্ব শেষ মিঃ বোস! বাচ্চুর খুনীকে এবার যথাস্থানে পাঠান। তারপর আপনার দিদার ঘরে বসে কফি খেতে খেতে সব কথা বলব। জয়ন্ত! তুমি খাঁড়াটা অফিসারদের দাও। ওই খাঁড়া দিয়ে বাচ্চুকে খুন করেছিল হরেকেষ্ট।...

বারান্দায় কালীপদ আর তার বউ জবা দাঁড়িয়ে ছিল। তারা দু'জনেই হতবাক। এখন রাজবাড়িতে আবার আলো জ্বলছে। মেন স্যুইচ অফ করা ছিল। কর্নেল অন করে দিয়েছেন। পাতালঘর আগের মতো বন্ধ করা হয়েছে। রানীমার ঘরে বসে কফি খেতে খেতে কর্নেল তাঁর রহস্য উন্মোচনের বিবরণ দিচ্ছিলেন। আমি আগাগোড়া সবটাই জানি বলে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে কিছু যুক্ত করতে চাইনে।

কর্নেল বললেন, কালীপদর একটা কথা প্রথমে হরেকেষ্টর দিকে আমার দৃষ্টি ফেরায়। কালীপদ বলেছিল, বুধবার বিকেলে হরেকেষ্ট কলকাতা রওনা হয়। অথচ সে আমার কাছে যায় শুক্রবার সকালে। তারপর সে আমাশা নিয়ে ফিরল শনিবার বিকেলে। আমাশা মিথ্যা, তার প্রমাণ পেলুম রবিবার সকালে। শনিবার রাত্রে মেন স্যুইচ অফ করে সে ফুলবাগানের ওখানে আসলে কী করছিল, তা রবিবার সকালে ক্যাকটাস দেখার ছলে গিয়ে জানতে পারলুম। 'একিনো-ক্যাকটাস গ্রুসোনাই'--কালীপদর ভাষায় 'কুমড়োপটাশ'-এর টবের তলায় কী ঝিকমিক করছিল। টব সরিয়ে দেখি, চেনছেঁড়া একটা মোটা চৌকো লকেট। আইভির গলা থেকে সে কলকাতায় এটা ছিনতাই করে এনে এখানে লুকিয়ে রেখেছিল। কারণ শনিবার সকালে তার ঘরের তালা ভেঙে তার হাতের লেখা খুঁজেছিলুম। একটা পঞ্জিকাতে লাল ডটপেনে তার

নামসই ছিল। মিলিয়ে দেখেছিলুম, রানীমাকে লেখা উড়ো চিঠির হস্তাক্ষরের স
মিলে যাচ্ছে। তালা ভাঙা লক্ষ করেই হরেকেষ্ট লকেটটা আর ঘরে রাখতে স
পায়নি। আঁচ করেছিল, আমি তাকে সন্দেহ করছি। তাই ক্রমশ সে মরিয়া
উঠছিল।

রানীমা জিজ্ঞেস করলেন, লকেট টমসায়েবের মেয়ের গলায় গেল কীভাবে?

কর্নেল বলেন, সেটা হালদারমশাই বলবেন। তবে লকেটে সিন্দুকের এক
চাবি লুকনো আছে কি না তখনও জানতুম না। আপনার কাছে পরে জানতে পার
অমনি সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই চিঠির নির্দেশমতো মন্দিরের পে
লালপাথরের ওপর আমি আপনার দ্বিতীয় চাবিটা রেখে এসেছিলুম। আমার
ছলের অভাব হয় না। পাখি বা প্রজাপতি দেখতে ওদিকে যেতেই পারি। এবার
করুন, হরেকেষ্ট সকালে আবার আমাশার ছলে লকেটটা আনতে ফুলবাগানের
গিয়েছিল। কালীপদ বাজার থেকে এসে দেখতে পেয়ে চ্যাঁচামেচি করছিল।
একটা কথা। এই পরচুলটা। হালদারমশাই বলবেন এটা কীভাবে আমার হাতে
কর্নেল জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে পরচুলাটা বের করে ভেতরটা দেখা
লক্ষ করুন এখানে লাল ছোপ। কিসের ছোপ? শুক্রবার সকালে যখন হরে
আমার কাছে যায়, তখন তার কপালে সিঁদুরের তিলক ঘষে একাকার হয়ে গিয়ে
পরচুলা পরার সময় কপালে ঘষা খেয়ে ওই অবস্থা হয়েছিল। যাই হোক, হরে
ক্রমে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এবার হালদারমশাই বলুন। তাঁর কথার সঙ্গে আমার
মিলিয়ে দেখলে সব স্পষ্ট হবে।

হালদারমশাই স্ট্যান্ডার্ড বাংলায় ইংরেজি মিশিয়ে তাঁর বিবরণ দিলেন।

অরবিন্দ বোস বললেন, হরেকেষ্ট বাংলোর কাছে সম্ভবত খাঁড়ার আঘাতে বা
লকেটের লোভেই খুন করেছিল। কিন্তু লকেট পায়নি। এখন কথা হল, বাচ্চুর
সে মুসলমানদের কবরখানা পর্যন্ত একা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল এটা বিশ্বাস হয়
জেরার চোটে তার পেট থেকে সব কথা বের করে নেব।

কর্নেল বললেন, তবে হরেকেষ্টর শরীর শক্ত-সমর্থ। বাচ্চুর রোগা ছিপছিপে।
কবরটা খুঁড়লে অন্তত এটুকু বোঝা যাবে, পথে কোথাও রক্ত পড়েনি কেন?
বাজারে কয়েকটা দোকানে খবর নিয়ে জেনেছি, হরেকেষ্ট একটা দোকান
কালীপুজোর দিন পাঁচ মিটার পলিথিন কিনেছিল। নাইলনের দড়িও কিনেছিল।
বুঝতে চেষ্টা করুন, কী অসাধারণ তার বুদ্ধি! হ্যাঁ— বলা দরকার। খ্রিস্টান প
যোশেফ আইভির চিঠি দিতে আসছিল বাচ্চুকে। পথেই হরেকেষ্টকে দেখতে
সে চিঠিটা তাকে দিয়েছিল। বাচ্চু কালীপদকে বিশ্বাস করত না সম্ভবত।
কালীপদ রানীমার কাছের লোক। তাই আইভির চিঠি সে তার বন্ধু যোশে

হরেকেষ্টর হাত দিয়ে পাঠাতে বলত। হরেকেষ্ট এই অবৈধ প্রণয়ের কথা জানত বলেই বাচ্চুর সঙ্গে রসিকতা করত। বাচ্চু বাড়াবাড়ি দেখলে রেগে যেত তার ওপর। জবা কালীপুজোর বিকেলে এই ঘটনা দেখেছিল। তাই না জবা?

জবা বাইরে থেকে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি বললুম, কবরের কাছে বাচ্চুর একপাটি চপ্পল কুড়িয়ে পাওয়ার কথাটা বলুন কর্নেল!

কর্নেল বললেন, এত রাত্রে আমি কাকেও জুতো দেখাতে রাজি নই।

ডি আই জি বোসসায়েব গম্ভীর মুখে বললেন, যে-কবরের কাছে জুতোটা পেয়েছেন, সেই কবরে বাচ্চুর ডেডবডি যদি না থাকে ?

আছে। কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, টাটকা কবরটার একটা দিক যে আবার খোঁড়া হয়েছিল, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। এমন কি, নাইলনের দড়ির একটুখানি মাটির ফাঁকে বেরিয়ে আছে, তা আমার চোখে পড়েছে।

এবার রানীমা বলে উঠলে, কালীপুজোর দিন বিকেলে মেলাকমিটির সেক্রেটারি চাঁদুবাবু এসেছিলেন হরেকেষ্টর কাছে। এতক্ষণে মনে হল কথাটা। আমি মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ কানে এল, মুসলমানপাড়ায় কে মারা গেছে আর তার কবর হচ্ছে। সেই নিয়ে দু'জনে কথা হচ্ছে। আমার অবাক লেগেছিল।

বোসসায়েব কথাটা শোনামাত্র সেলুলার ফোন বের করে বললেন, চাঁদতারণ মুখুয্যেরই চক্রান্ত। তাকে এখনই অ্যারেস্ট করতে বলছি। তার উদ্দেশ্য ছিল একঢিলে দুই পাখি বধ। পিসিমার এই রাজবাড়ি দখল আর পিসেমশাইয়ের অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ আত্মসাৎ। হরেকেষ্টকে সে-ই লোভ দেখিয়েছিল।

কর্নেল সায় দিলেন, ঠিক ধরেছেন মিঃ বোস....

সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ

পূর্বাচল হোটেলের ব্যালকনিতে বসে চা খেতে খেতে সমুদ্র দেখছিলাম। অক্টোবর মাসের বিকেল। দুপুরে কিছুক্ষণ ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়েছিল। এখন উজ্জ্বল সোনালি রোদ। যদিও পূর্বের সমুদ্র দিগন্ত-ঘন ধূসর মেঘে ঢাকা। আমার ডানদিকে বালিয়াড়ির ওপর ঝাউবন। বালিয়াড়ি আর ঝাউবনের ভেতর বড়-বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে। সেই সব পাথরে প্রেমিক-প্রেমিকারা বসে আছে। এখানে সি-বিচ সংকীর্ণ এবং কিছুটা ঢালু। পূর্বাচলের নীচে পিচের রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা কম। কারণ এই এলাকায় খুব খরুচে হোটেল আর ধনবানদের বাড়ি। এখানকার নাম নিউ চন্দনপুর। পিচের রাস্তাটা আমার বাঁদিকে সোজা উত্তরে এগিয়ে সমুদ্রের ব্যাকওয়াটারের ওপর ব্রিজে মিশেছে। ব্রিজের ওধারে ওল্ড চন্দনপুর। সবমিলিয়ে 'চন্দনপুর-অন-সি' নামেই পরিচিত।

বাঁদিকে তাকিয়ে দেখলুম আমার বৃদ্ধ বন্ধু প্রকৃতিবিজ্ঞানী কর্নেল নীলাদ্রি সরকার একটা পাথরে বসে বাইনোকুলারে সমুদ্র দর্শন করছেন। উত্তরের ব্যাকওয়াটার পর্যন্ত এই অংশটা ত্রিভুজের মতো। পিচ রাস্তার ডাইনে ঘাসে ঢাকা মাটি। তারপর মাটিটা উঁচু হয়েছে এবং সেই উঁচু অংশে বুনো কুলের ঝোপঝাড়, কেয়াবন, শীর্ষে ঘন কাশবন। এদিকটাতেও নানা ধরনের কালো পাথর পড়ে আছে। পাথর সমুদ্রেও ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখে মনে হয়, পালে-পালে হাতি সমুদ্রস্নানে নেমেছে। জোরালো হাওয়ার জন্য সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ এসে ফেনায় ফেনায় ঢেকে ফেলছে পাথরগুলো এবং তারপর আছড়ে এসে ছড়িয়ে যাচ্ছে বিচে। আর সে কী ভয়াল গর্জন। মনে হচ্ছিল, সমুদ্র থেকে যেন মৃত্যুর গন্ধ ভেসে আসছে।

ত্রিভুজাকৃতি জমিটার শেষপ্রান্তে ব্যাকওয়াটারের মাথায় কোন যুগের পাথরের একটা দুর্গ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। সেখানেও প্রেমিক-প্রেমিকার যুগল মূর্তি চোখে পড়ল। বিকেলের সোনালি রোদ ক্রমে রক্তিম হচ্ছিল। মনে হল সর্বত্র যেন অপরূপ প্রাকৃতিক ভাস্কর্য ছড়িয়ে আছে।

একটু পরে দেখলুম, কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঢালু বালিয়াড়ি দিয়ে নেমে পিচ রাস্তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে ডাইনে ঘাসজমির দিকে ঘুরলেন এবং হঠাৎ গুঁড়ি মিরে ফুলের ঝোপ-ঝাড়ের কাছে গিয়ে ক্যামেরা তাক করলেন। নিশ্চয় কোনো বিরল প্রজাতির প্রজাপতির দর্শন পেয়েছেন এবং তাকে উনি ক্যামেরাবন্দি করতে চান।

কিন্তু যা বুঝলুম, প্রজাপতিটা মহা ধূর্ত। কর্নেল আবার গুঁড়ি মেরে মুখ তুলতেই ওঁর টুপিটা ঘাসে পড়ে গেল এবং চওড়া টাক ঝলমলিয়ে উঠল।

প্রজাপতির ছবি তুলতে পারলেন কি না জানি না, এবার তিনি উঠে দাঁড়লেন এবং ঘাস থেকে টুপিটা কুড়িয়ে মাথায় পরলেন। তারপর কেন যেন স্থির হয়ে দাঁড়ালেন।

এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দৃশ্যটা আমার চোখে পড়ল। কিছুটা দূরে ঘাসজমিতে একটা গাধা চরছে এবং নোংরা জীর্ণ স্যুট-টাই পরা সেই পাগল ভদ্রলোক হেসে ঝুঁকে পড়ছেন। বারকতক লেজে টান পড়ার পর গাধাটা এবার জোরে পা ছুড়েছিল নিশ্চয়! তা না হলে ভদ্রলোক পড়ে যাবেন কেন? উনি উঠে গাধাটার দিকে আঙুল তুলে হুমকি দিতে থাকলেন। গাধাটা সম্ভবত হুমকির চোটে ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

কর্নেল এতক্ষণে হোটেলের দিকে আসছিলেন। রাস্তা পেরিয়ে তিনি একটুখানি চড়াইপথে এই হোটেলের গেটে পৌঁছেছেন, এমন সময় সেই পাগলাবাবু এসে গেলেন। তারপর কর্নেলকে বললেন, 'এই যে স্যার! এক কাপ কফি হবে নাকি? তার বদলে গান শোনাব। মাইরি! মা কালীর দিব্যি। শুনুন না একটুখানি-- জাস্ট স্যাম্পল্।'

বলে তিনি বিদঘুটে সুরে আমার ছেলেবেলার পড়া এই পদ্যটা গানের মতো গাইতে শুরু করলেন--

'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল
ও ভাই, সকলি ফুটিল
মাইরি, সকলি ফুটিল...'

তার সঙ্গে মাথায় এক হাত আর কোমরে এক হাত রেখে তিনি নাচ জুড়ে দিলেন। কর্নেল তুম্বো মুখে দাঁড়িয়ে গেছেন। পাগলাবাবু তেমনি সুর ধরে গাইছেন :

রাতি পোহাইল, মাইরি রাতি পোহাইল
ও ভাই রাতি পোহাইল...'

হোটেলের দারোয়ান গেটে গিয়ে পাগলাবাবুকে ধমক দিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কর্নেল ওঁকে ইসারায় ডেকে রাস্তার ধারে অর্থাৎ একটা রোডসাইড কাফেতে নিয়ে

গেলেন। তারপর দেখলুম, কর্নেল একটা পেপারকাপে ভর্তি কফি ওঁকে দিয়ে নিজেও একটা পেপারকাপে কফি নিলেন। তারপর পাগলাবাবুর সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বলতে থাকলেন। পাগলাবাবু এক হাত নেড়ে ফু দিয়ে কফি পান করতে করতে কথা বলছিলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আচমকা ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি এসে গেল। অমনি পাগলাবাবু দৌড়ে হোটেলের নীচের রাস্তা দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। কর্নেল হন্তদন্ত হোটেলে ফিরে এলেন। একটা হিড়িক ফেলে দিয়েছিল আকস্মিক বেসুরো বৃষ্টিটা। সর্বত্র প্রেমিক-প্রেমিকারা মাথা বাঁচাতে ছত্রভঙ্গ হচ্ছিল।

দোতলায় কর্নেল ওঠার আগেই স্যুইটের দরজা খুলে দিলুম। বৃদ্ধ প্রকৃতিবিজ্ঞানী একটু হেসে বললেন, 'জয়ন্তের ভাতঘুমটা আশা করি ভালোই হয়েছে।'

বললুম, 'হয়েছে। কিন্তু পাগলাবাবুর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আপনি কফি খাইয়ে দিলেন দেখে মুগ্ধ হয়েছি।'

কর্নেল ব্যালকনিতে বসতে গিয়ে পিছিয়ে এলেন। বৃষ্টির ছাঁট আসছিল। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে ঘরেই বসলেন। বললেন, 'এককাপ কফির জন্য ভদ্রলোক অত পরিশ্রম করলেন! কী আর করা যাবে।' তারপর তিনি চুরুট ধরালেন। 'তোমার সাংবাদিক বন্ধুরা কি সবাই চলে গেছে?'

'হ্যাঁ। গতকাল আপনাদের প্রকৃতি-পরিবেশ সম্মেলন শেষ। আজ থাকতে হলে নিজের পয়সা খরচ হত। আমি থেকে গেলুম আপনার গেস্ট হিসেবে।'

কর্নেল চুপচাপ কিছুক্ষণ চুরুট টানার পর বললেন, 'বিজ্ঞানী ভদ্রলোকরাও অনেকে চলে গেছেন। অনেকে আছেন। বিশেষ করে জৈব রসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ বিক্রমজিৎ পাণ্ডে আছেন। উনি চলে যাবেন আগামীকাল। আর দেখলুম ডঃ কৌশল্যা বর্মন আছেন। উনি ডি এন এ নিয়ে রিসার্চ করেন। আর আণবিক জীববিজ্ঞানী ডঃ পরিমল হাজরাকে দেখলুম।'

'ডঃ কৌশল্যা বর্মন জিনোম-তত্ত্ব নিয়ে কী পেপার পড়লেন একবর্ণ মাথায় ঢোকেনি।'

কর্নেল হাসলেন। 'ও সব তো তোমার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার পাঠকরা খাবে না। যা খাবে--'

ওঁর কথার ওপর বললুম, 'তা হল রহস্য-রোমাঞ্চ। ধরুন, সমুদ্রতীরে হত্যাকাণ্ড! অথবা বিজ্ঞানীর রহস্যময় অন্তর্ধান। বিশেষ করে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার যদি সেখানে থাকেন!'

কর্নেল সাদা দাড়ি থেকে কী একটা পোকা বের করে ব্যালকনির দিকে ছুড়ে ফেললেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'নাহ্। আর রহস্য-টহস্য নয়। কারো

ব্যাপারে নাক গলানোর ইচ্ছে নেই।'

একটু নড়ে বসলুম। 'তার মানে কারো কোনো ব্যাপার আপনার চোখে পড়েছে?'

কর্নেল নির্বিকার মুখে বললেন, 'জয়ন্ত! তুমি যেখানেই যাবে, কোনো-না-কোনো ব্যাপার তোমার চোখে পড়বেই। চন্দনপুর-অন-সিতে আমি আগেও এসেছি। পুরো এলাকা আমার চেনা। আর আমার এই বাইনোকুলার দিয়ে উঁচু জায়গা থেকে চারদিক লক্ষ্য করলে-- হ্যাঁ, কিছু-কিছু দৃশ্য আপাতদৃষ্টে রহস্যময় মনে হতেই পারে। কিন্তু খোঁজখবর নিলে দেখা যাবে ওতে কোনো রহস্যই নেই। যেমন ধরো, জিনোম বা ডি এন এ বিজ্ঞানী ডঃ কৌশল্যা দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর কেন যেন তক্ষুণি পা চালিয়ে চলে এলেন। তারপর দেখলুম, ডঃ পরিমল হাজরা ওখানে এক মহিলার পাশে বসে আছেন। কিন্তু সেই মহিলা তাঁর স্ত্রী নন। তাঁরই ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রাবন্তী সেন! কাজেই—'

হাসতে হাসতে বললুম, 'পরকীয়া প্রেম বা অবৈধ প্রণয়?'

দাড়িতে হাত বুলিয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানী বললেন, 'না জেনে দুম করে সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো ঠিক নয়, জয়ন্ত!'

'ডঃ হাজরার স্ত্রীকে দেখতে পাননি কোথাও?'

'মিসেস মালবিকা হাজরা সি-বিচে বিকেলে ডঃ বিক্রমজিৎ পাণ্ডের সঙ্গে হাঁটছিলেন।' বলেই কর্নেল মাথা নাড়লেন। 'নাহ্। এ থেকেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না। জয়ন্ত! সমুদ্রই একমাত্র প্রাকৃতিক পটভূমি, যেখানে এলে মানুষের মন স্বাধীন হয়ে ওঠে। তবে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। কারণ প্রত্যেকের নিজস্ব কাজকর্ম আছে। যেমন, ডঃ পাণ্ডে। উনি হঠাৎ মিসেস হাজরাকে নিঃসঙ্গ করে চলে আসছিলেন। মিসেস হাজরারও সম্ভবত স্বামীকে মনে পড়ায় তাঁর খোঁজে চলে এলেন।

বৃষ্টিটা হঠাৎ থেমে গেছে কখন। নিউ চন্দনপুরে সি-বিচ কিছুটা বিপজ্জনক বলে বিচের মাথায় ইতস্তত লাইটপোস্ট। এখন বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। ডানদিকের বালিয়াড়িতে ঝাউবনের ভেতর বাতিগুলো লুকোচুরি খেলছে যেন। হাওয়া এখন আরো জোরালো। সন্ধ্যার সমুদ্র আরো ভয়াল এবং হিংস্র। মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে নিউ চন্দনপুরের ওপর।

কর্নেল বললেন, 'রোডসাইড কাফেতে কফি খেয়ে তৃপ্তি পাইনি। তুমি সুইচ টিপে হোটেল বয়দের ডাকো। এক প্লেট গরম পকৌড়া আর এক পট কফি আনতে বলো!'

আমি সুইচ টিপতে যাচ্ছি, দরজায় কেউ নক করল। দরজা খুলে দেখি মহীতোষ বিশ্বাস। তিনি বললেন, 'একটু বিরক্ত করতে এলুম জয়ন্তবাবু! কর্নেল সায়েব ফিরেছেন?'

কর্নেল ডাকলেন, 'আরে মহীতোষবাবু যে। আসুন, আসুন! জয়ন্ত তুমি তিনটে

কাপ আনতে বলবে।'

সুইচ টেপার মিনিট দুয়েকের মধ্যে মধ্যবয়স্ক হোটেলবয় নব এসে সেলাম দিল। তাকে শিগগির কফি পকৌড়া আনতে বলে দরজা খোলা রাখলুম। মহীতোষবাবু ধনবান বাঙালি ব্যবসায়ী। তার মাছের আড়ত আছে ওল্ড চন্দনপুরে। কিন্তু বাস করেন নিউ চন্দনপুরে। কর্নেলের তিনি পূর্বপরিচিত। সেই সূত্রে আমাব সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়েছে।

মহীতোষবাবু কর্নেলের পাশে চেয়ার টেনে বসে বললেন, 'কর্নেল সায়েবের কনফারেন্স তো শেষ। আমি এলুম আপনাদের নেমন্তন্ন করতে। হোটেলে খামোকা পয়সা খরচ না করে--'

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, 'আজকের দিন-রাতের খরচও সরকারি পরিবেশ দফতর দেবে।'

মহীতোষবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। কাল সকালে আমার গেস্ট হোন আপনারা। আমি নিজে এসে গাড়িতে আপনাদের তুলে নিয়ে যাব। কটা নাগাদ আসব বলুন?'

কর্নেল তাঁর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন, 'সেবার আপনার গেস্ট হয়ে এসেছিলুম একটা বিশেষ কারণে। এবারও কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?'

মহীতোষবাবু হাসি মুখে বললেন, 'না, না কর্নেল সায়েব! আপনি কি ভাবছেন নিজের স্বার্থের জন্য আপনাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি? আপনি আমাকে সেবার কী বাঁচা না বাঁচিয়েছিলেন! আমার শত্রুদের চিরদিনের জন্য টিট করে দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতাবোধ কি আমার থাকতে নেই? তবে আপনারও ভালো লাগবে। আমার বাগানে কয়েকটা বিদেশি ক্যাক্টাস এনে রেখেছি। পছন্দ হলে আপনি দু-একটা নিয়ে কলকাতা ফিরবেন। আর আমার মালী চরণদাস কথায়-কথায় বলছিল, মাসান্ডার পাহাড়ি জঙ্গলে সে কী সব অদ্ভুত অর্কিড দেখে এসেছে। সেগুলোতে নানা রঙের ফুল!'

কর্নেল বললেন, 'আপনি লোভ না দেখালেও কাল ভোরে মাসান্ডা ফরেস্টে আমি যেতুম। এই হোটেলের মালিক ট্যুরিস্টদের জন্য জিপ বা কার ভাড়ার ব্যবস্থা রেখেছেন!'

নব ট্রেতে পকৌড়ো-কফি রেখে গেলে দরজা এঁটে দিলুম। মহীতোষবাবু অভিমানী মুখে বললেন, 'তা আপনি যদি এ গরিবের পর্ণকুটিরে পায়ের ধুলো না দেন, জোর করতে তো পারি না!'

কর্নেল তাঁর কাঁধে হাত রেখে একটু হেসে বললেন, 'ঠিক আছে মহীতোষবাবু! আপনার গেস্ট হওয়া নিশ্চয় আমার কাছে আনন্দের ব্যাপার। সকাল আটটা নাগাদ বরং আসবেন।' ...

কিছুক্ষণ পরে মৎস্যব্যবসায়ী ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমি কর্নেলকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, কেন ওঁর বাড়ি যেতে আপনার আপত্তি ছিল, এমন সময় দরজায় কেউ জোরে কয়েকবার নক করল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম। আমার পাশ কাটিয়ে মহিলাবিজ্ঞানী কৌশল্যা বর্মন ঘরে ঢুকে কর্নেলের পাশে গিয়ে বসলেন। তাঁকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। কর্নেল বললেন, 'কী হয়েছে কৌশল্যাদেবী?'

কৌশল্যা বর্মন চাপা স্বরে বললেন, 'আশ্চর্য ঘটনা কর্নেল সরকার! আমার ঘরে একটা ব্রিফকেসে খুব ইমপর্ট্যান্ট রিসার্চ ডকুমেন্ট ছিল। ব্রিফকেসের তালা ভেঙে ফাইলটা কেউ চুরি করেছে। এইমাত্র ডঃ আচারিয়ার কাছ থেকে স্যুইটে ফিরে দেখি, দরজা ঠিকই লক করা আছে। অথচ টেবিলে ব্রিফকেসের তালা ভাঙা।'

'আপনি তো তিনতলায় সতের নাম্বার স্যুইটে আছেন?'

'হ্যাঁ। ডাবলবেড স্যুইট। আমার স্যুইটে ডঃ পরিমল হাজরার অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটিকে থাকতে দিয়েছিলুম। ডঃ হাজরার অনুরোধে।'

'শ্রাবন্তী সেনের কাছে ডুপ্লিকেট চাবি ছিল কি?'

'ছিল। দরজায় ইন্টারলকিং সিস্টেম। ভেতর থেকে চাবি ছাড়াই দরজা খোলা যায়। কিন্তু বাইরে থেকে দরজা খুলতে চাবির দরকার হয়।'

'শ্রাবন্তীর খোঁজ নিয়েছেন?'

কৌশল্যা আরও চাপা স্বরে বললেন, 'বিকেলে দুর্গপ্রাসাদের ওখানে ডঃ হাজরার পাশে শ্রাবন্তী বসে ছিল। বসে থাকার ভঙ্গিটা অশালীন। তাই আমি ওখান থেকে তক্ষুনি সরে এসেছিলুম।'

'হুঁ। আমি তা লক্ষ্য করেছিলুম। কিন্তু শ্রাবন্তীর খোঁজ নিয়েছেন কি?'

'সে নাকি এখনও হোটেলে ফেরেনি। ডঃ হাজরা আর তাঁর স্ত্রী মালবিকা ক্যান্টিনে বসেছিলেন। তাঁদের জিজ্ঞেস করেছি। মিসেস হাজরা শ্রাবন্তীকে দেখেননি। ডঃ হাজরা আমার মুখের ওপর মিথ্যা বললেন। তিনিও নাকি তাকে দেখেননি। আমার রাগ হয়েছিল। তবু মাথা ঠাণ্ডা রাখতেই হল। আমি চাই না ওঁদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ শুরু হোক। তো হোটেলবয়রা কিংবা রিসেপশনের কেউ-ই বলতে পারল না শ্রাবন্তী কোথায়! এখন আমি কী করব, তা নিয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলুম। আমি কি ঘটনাটা পুলিশকে জানাব?'

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আর আধঘণ্টা অপেক্ষা করে দেখুন শ্রাবন্তী ফিরছে কি না। তবে আমি এখনই আপনার স্যুইটে যেতে চাই।'

কথা অবশ্য ইংরেজিতে হচ্ছিল। কৌশল্যার মুখে উত্তেজনার পর বিষণ্ণতার ছাপ পড়েছে এবার। তিনি বললেন, 'আমি আপনার অন্য পরিচয় জানি কর্নেল সরকার। তাই আপনার কাছেই প্রথমে ছুটে এসেছি। পুলিশের ওপর আমার আস্থা নেই। ওই

ফাইলটা কোনো জিনোমবিজ্ঞানীর হাতে গেলে তিনিই আমার আবিষ্কারের কৃতিত্ব কেড়ে নেবেন। তাছাড়া আমার ফরমুলাটাও যেমন খুব ভালো, তেমনি সাংঘাতিক খারাপ!'

কর্নেল আমার দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে বললুম, 'প্লিজ কর্নেল! আমিও যেতে চাই!'

কৌশল্যা বললেন, 'আসুন! আপনি সাংবাদিক। আপনারও পর্যবেক্ষণ শক্তি থাকা উচিত। কিন্তু দয়া করে ঘটনাটা যেন আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করবেন না। আমি সরকারের বেতনভোগী বিজ্ঞানী। ঝামেলায় পড়ব।'

তাঁকে আশ্বস্ত করে ব্যালকনির দিকের দরজা এবং বাইরে যাওয়ার দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলুম। তিনতলায় সতের নম্বর স্যুইট সিঁড়ির মাথায় বাঁদিকে। কৌশল্যা চাবি দিয়ে দরজা খুললেন। ঘরে আলো জ্বলছিল। আমরা ঘরে ঢুকলে কৌশল্যা দরজা এঁটে দিলেন।

কর্নেল মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মেঝেয় নারকেল ছোবড়ার রঙিন কার্পেট। হঠাৎ তিনি ঝুঁকে একটা খুদে লাল ফুল তুলে নিলেন। ফুলটা দেখতে কতকটা সন্ধ্যামণি ফুলের মতো। কিন্তু বেঁটে। কৌশল্যা বললেন, 'কী ওটা?'

'এগুলো বুনো ফুল। দুর্গপ্রাসাদ পর্যন্ত এই বুনো ফুলের ঝোপ আছে।'

'হ্যাঁ। দেখেছি।'

'আপনি কি খোঁপায় এই ফুলের একটা গুচ্ছ তুলে গুঁজেছিলেন?'

'নাহ্। ফুল আমি ভালবাসি। কিন্তু বুনোফুল খোঁপায় গুঁজে রাখার মতো রোম্যান্টিক মন তখন ছিল না।'

'কোন খাটে শ্রাবন্তী শোয়?'

'এই বাঁদিকের খাটে। ওই দেখুন ওর স্যুটকেস আর ব্যাগ।'

'তাহলে শ্রাবন্তী পালিয়ে যায়নি।'

'গেলেই বা কী? ওই ফাইলটা কোনো জিনোমবিজ্ঞানীকে বেচলে সে প্রচুর টাকা পাবে।' বলে কৌশল্যা তাঁর খাটের মাথার দিকে টেবিলের ওপর খোলা ব্রিফকেসটার ডালা তুললেন। ভেতরে একগাদা কাগজ আছে। কৌশল্যা কাগজের শিটগুলো তুলে বললেন, 'এগুলোর তলায় লাল রঙের ফাইলটা ছিল। আট ইঞ্চি লম্বা, চার ইঞ্চি চওড়া। চেন আঁটা যায়।'

কর্নেল পকেট থেকে খুদে টর্চ বের করে কৌশল্যার খাটের তলা দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ব্রিফকেসটার তালা পরীক্ষা করে বললেন, 'শক্ত কিছু দিয়ে -- সম্ভবত ছোট স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে জোরে টানার ফলে তালাটা উপড়ে গেছে ব্রিফকেসের নীচের অংশ থেকে। অত গুরুত্বপূর্ণ ফাইল এখানে রাখা উচিত হয়নি কৌশল্যাদেবী।'

কৌশল্যা বললেন, আসলে ভেবেছিলুম, অমন একটা জিনিস এই সাধারণ ব্রিফকেসে রাখার কথা কেউ ভাবতে পারবে না।'

'আপনি কি কথাপ্রসঙ্গে কারও কাছে আপনার আবিষ্কার সম্পর্কে আভাসে কিছু বলেছিলেন?'

'যেটুকু বলার, তা তো সম্মেলনে পেপার পড়ার সময় বলেছি। আপনার মনে থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ। আপনি বলেছিলেন, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ওয়াটসন ডি এন এ-র গঠন আবিষ্কার করেছিলেন। আপনি সেই প্রাকৃতিক গঠনকে আদলবদল করার সম্ভাবনা সম্পর্কে আভাস দিয়েছিলেন। ডি এন এ-র স্ট্রাকচার বদলে দিয়ে কিম্ভূত-কিমাকার উদ্ভিদ বা প্রাণী সৃষ্টি হতে পারে।'

'হ্যাঁ। আমার আবিষ্কারটা ফরমুলার আকারে লেখা ছিল ফাইলে।'

'আপনার দিল্লির ল্যাবরেটরিতে কি থিয়োরিটা প্রয়োগ করে ফল পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। খুদে কয়েকটা পিঁপড়ের ডিম থেকে ভীমরুলের মতো মোটা পিঁপড়ের জন্ম হয়েছে। সাংঘাতিক বিষাক্ত সেগুলো!'

কর্নেল তুম্বো মুখে বললেন, 'যাই হোক, আমি বিকেলে বাইনোকুলারে দূর থেকে দেখেছিলুম, ডঃ হাজরা তাঁর ল্যাব-অ্যাসিস্ট্যান্টের খোঁপায় এই বুনো ফুলের গুচ্ছ গুঁজে দিচ্ছেন। অতএব এটা ঠিক, শ্রাবন্তী ফিরে এসে এই ঘরে যখন ঢুকেছিল তখন আপনি ঘরে ছিলেন না। বৃষ্টির সময় কোথায় ছিলেন আপনি?'

কৌশল্যা বললেন, 'আমি হোটেল দ্য শার্কে পরিবেশবিজ্ঞানী ডঃ রঘুবীর আচারিয়ার সঙ্গে গল্প করছিলাম। উনি আজ রাতেই দিল্লি যাবেন। আমার যাবার কথা কাল দুপুরের ট্রেনে। এখন দেখুন, কী সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল!'

কর্নেল আবার ঘরের ভেতর চোখ বুলিয়ে ব্যালকনির দিকের দরজার কাছে গেলেন। তারপর বললেন, 'এই দরজাটা বন্ধ নেই দেখছি!'

কৌশল্যা চমকে উঠে বললেন, 'সে কী! শ্রাবন্তী বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমি বেরিয়েছিলুম। তখন ওই দরজার ছিটকিনি এঁটে দিয়েছিলুম!'

কর্নেল ভেজানো দরজা খুলে বললেন, 'ব্যালকনির আলোটা জ্বেলে দিন!'

কৌশল্যা সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। তারপর তাঁর কাছে গেলেন।

কর্নেল ব্যালকনি থেকে আর একটা খুদে লাল ফুল কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'শ্রাবন্তী এই ব্যালকনিতে এসেছিল।' তারপর তিনি গুঁড়ি মেরে নীচেটা দেখে বললেন, 'নীচের লনে ফুলের ঝোপঝাড় আছে। ফাইলটা সে প্রকাশ্যে নিয়ে যেতে পারেনি সম্ভবত-- যদি অবশ্য শ্রাবন্তীই ফাইলচোর হয়!'

কৌশল্যা একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'যদি কী বলছেন কর্নেল সরকার? আমার

অনুপস্থিতিতে সে দুর্গপ্রাসাদ থেকে স্যুইটে ফিরেছিল, এর প্রমাণ তো বুনো ফুল!'

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'হ্যাঁ। তো ফাইলচোর ফাইলটা এখান থেকে নীচে ছুড়ে ফেলেছিল কি না বলা কঠিন। কারণ তাতেও ঝুঁকি আছে। দোতলার ব্যালকনি এবং নীচে ক্যান্টিনের জানালা দিয়ে কারও-না-কারও ব্যাপারটা চোখে পড়ার কথা। তবে শুধু এটা স্পষ্ট, শ্রাবস্তী এই ব্যালকনিতে এসেছিল। তারপর বোঝাই যাচ্ছে, ব্যালকনির দরজা বন্ধ না করে শুধু ভেজিয়ে রেখে সে বেরিয়ে যায়। তা থেকে আমার সিদ্ধান্ত, সে শিগগির ফিরে আসবে ভেবেছিল। কিন্তু কোনো কারণে সে এখনও ফিরছে না। এটা সরল পাটিগণিত কৌশল্যাদেবী।'

কৌশল্যা ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছু ভাবছিলেন। বললেন, 'এবার বলুন আমার কী করা উচিত।'

কর্নেল বললেন, 'আপনি বরং আপাতত একটা কাজ করতে পারেন। অবশ্য সেটা আপনার স্বাধীন ইচ্ছা। আমার মতে, আপনি ডঃ হাজরার সঙ্গে দেখা করে শুধু তাঁকে জানিয়ে দিন, তাঁর ল্যাব-অ্যাসিস্টান্ট শ্রাবস্তী সেন এখনও স্যুইটে ফেরেনি। তাই আপনি উদ্বিগ্ন। এ কথা শুনে তিনি কী বলেন, সেটা আমার মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ। তারপর ডঃ হাজরার প্রতিক্রিয়া আমাকে টেলিফোনে জানান। পি বি এক্স অপারেটরের সাহায্য নেওয়ার দরকার নেই। এই হোটেলে প্রত্যেক স্যুইটে সরাসরি ফোন করা যায়। আমার স্যুইটের ইন্টারলিংক ফোন নাম্বার ২১। আপনার?'

'বত্রিশ।'

'হ্যাঁ। আগে জিরো ডায়াল করে ডায়ালটোন পেলে তবে সরাসরি ফোন করা যাবে।'

'জানি।' ...

আমরা দোতলায় আমাদের স্যুইটে ফিরে এলুম। কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, 'মোটে ৭টা ১৫ মিনিট। জয়ন্ত! তাহলে তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হল। একটা রোমাঞ্চকর স্টোরির লেজ দেখতে পেলে। তবে আমার দুর্ভাগ্য, যেখানে যাই, সেখানেই একটা ঝামেলায় পড়ি।'

বললুম, 'শ্রাবস্তী এত বোকামি করবে বিশ্বাস হয় না। একই ঘরে থেকে এমন সাংঘাতিক চুরি করে বসবে? ধরুন, নিজের জিনিসপত্র ফেলে পালালেও তো তার জানা উচিত, পুলিশ তার নামে হুলিয়া জারি করবে!'

কর্নেল চুপচাপ বসে চুরুট ধরালেন। চোখ দুটি বন্ধ করে হেলান দিলেন।

ব্যালকনির দরজা খুলেই কানে এল পাগলাবাবুর গান। নীচের রাস্তায় নেচে নেচে গাইছেন :

'রাতি পোহাইল-- মাইরি! রাতি পোহাইল...'

পাগলাবাবুর নাচগান কিছুক্ষণ শুনে ঘরে এলুম। এই সময় ফোন বাজল। কর্নেল ফোন তুলে সাড়া দিয়ে বললেন, 'বলুন কৌশল্যাদেবী! ... অ্যাঁ? বলেন কী? ... ঠিক আছে। অপেক্ষা করুন। ... হ্যাঁ। চুপচাপ অপেক্ষা করুন।' ফোন রেখে কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'ডঃ হাজরা কৌশল্যাদেবীর কথা শুনেই এবার সর্বনাশ বলে সবেগে বেরিয়ে গেছেন।' ...

।। দুই ।।

রাত নটায় আমরা দু'জনে নীচে ক্যান্টিনে গেলুম। কর্নেল দু'বার কৌশল্যাদেবীর সুইটে সরাসরি ফোন করেও সাড়া পাননি। বোঝা যায়, তিনি সুইটে তখনও ফেরেননি।

পূর্বাচল থ্রি-স্টার মার্কা হোটেল। বিত্তবানরাই এখানে ওঠেন। নীচের ক্যান্টিনহলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন বোর্ডাররা। বাইরের লোকেদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবে বোর্ডারের গেস্ট হিসাবে বাইরের লোক আসতে পারেন। ক্যান্টিনে বসে প্রবীণেরা এখনই ডিনার খাচ্ছেন। বেশির ভাগই দাম্পতি। তবে যুবক-যুবতীদের দেখে বলা কঠিন, তারা দম্পতি না নিছক প্রেমিক-প্রেমিকা। কেউ কেউ চা বা কফির কাপ টেবিলে রেখে চাপা স্বরে কথা বলছে।

কর্নেল ক্যান্টিনের ভেতর চোখ বুলিয়ে লাউঞ্জে গেলেন। লাউঞ্জের শেষপ্রান্তে বার। সেখানে শুধু ক'জন নানাবয়সী পুরুষ বিয়ার বা হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে।

লাউঞ্জের অন্যপ্রান্তে একা বসেছিলেন ডঃ বিক্রমজিৎ পাণ্ডে। কর্নেলকে দেখে মৃদুস্বরে বলে উঠলেন, 'হ্যালো-ও!'

কর্নেল বললেন, 'আজ রাতের আবহাওয়া চমৎকার ডঃ পাণ্ডে!'

তিনি কাছাকাছি একটা ভেলভেটে মোড়া চেয়ারে বসলেন। আমি বসলুম একটা কারুকার্যখচিত থামের পাশে বসানো চেয়ারে। হাতের কাছে অ্যাশট্রে দেখে সিগারেট ধরালুম।

ডঃ পাণ্ডে বললেন, 'আবহাওয়া চমৎকার, নাকি দূষিত কর্নেল সরকার?'

'কেন ডঃ পাণ্ডে?'

'মিসেস হাজরা কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন, তাঁর স্বামীর ল্যাব-অ্যাসিস্টান্টকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'বিকেলে আপনি আর মিসেস মালবিকা হাজরা বিচে ঘুরছিলেন।'

ডঃ পাণ্ডেও হাসলেন। স্বামীকে খুঁজে না পেয়ে ভদ্রমহিলা রাগ করে বিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে সঙ্গ দিলুম। তবে এ বয়সে আমার মধ্যে রোম্যান্টিসিজ্‌ম বলতে আর কিছু নেই।'

'ডঃ কৌশল্যা বর্মনকে দেখেছেন কি?'

'হাজরা বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে গেছেন। লক্ষ্য করেছি, উনি একটা অটো রিকশাতে চেপে কোথাও গেলেন।'

'ডঃ হাজরা কি পায়ে হেঁটে গেছেন?'

'হ্যাঁ। হাতে টর্চও দেখেছি। সম্ভবত সি-বিচে গেছেন।'

'ওখানে তো যথেষ্ট আলো আছে।'

ডঃ পাণ্ডে চোখে হেসে বললেন, 'আলোর তলায় অন্ধকার থাকে। কাল বিকেলের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর সি-বিচের দিকে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ চোখে পড়েছিল, মেয়েটি-- মানে হাজরার ল্যাব-অ্যাসিস্টান্ট ওই ঝাউবনের শেষ দিকটাতে একজন যুবকের সঙ্গে কথা বলছে। না—দুজনেই দাঁড়িয়েছিল। তাকপর যুবকটি সোজা এদিকে চলে এল। মেয়েটি বিচে নামল। আমি কাছাকাছি যেতেই সে আমাকে 'হাই' সম্ভাষণ করে উল্টো দিকে চলে গেল।'

'আপনার পর্যবেক্ষণশক্তি অসাধারণ ডঃ পাণ্ডে!'

ডঃ পাণ্ডে গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'যুবকটিকে আমি সমুদ্রবিজ্ঞানভবনে আমাদের কনফারেন্স হলে দেখেছি। ফিল্মের হিরো টাইপ পোশাক ও চেহারা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে হাজরার ল্যাব-অ্যাসিস্ট্যান্টের প্রেমিক। সম্ভবত হাজরার অজ্ঞাতসারে সে তার প্রেমিকাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছে।'

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'আপনি মুখে বললে কী হবে ডঃ পাণ্ডে? আপনি ভেতরে ভেতরে রোম্যান্টিক।'

'না, না। উল্টোটা। আমি কোনো ঘটনার বাস্তব দিকটাই বিচার করি। হাজরার এসব লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ-ধরুন, সে কোনো নতুন কিছু আবিষ্কার করল, বিশেষ করে ওর সাবজেক্ট হল আণবিক জীববিজ্ঞান তার ল্যাব-অ্যাসিস্টান্ট, কী যেন নামটা?'

'শ্রাবন্তী সেন।'

'হ্যাঁ। শ্রাবন্তী সেটা জানতেই পারে এবং কথাপ্রসঙ্গে তার প্রেমিকের কানে কথাটা তুলতে পারে। এসব ক্ষেত্রে গোপনীয়তা খুব দরকার। কারণ সারা বিশ্বে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখন সহযোগিতার তুলনায় প্রতিযোগিতাই বেশি। আমার ল্যাব-অ্যাসিস্ট্যান্টদের দিয়ে আমি কাজ করিয়ে নিই। তাদের বেশি পাত্তা দিই না। সেইজন্য তাদের কাউকে সঙ্গে আনিনি।'

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, 'আপনি ডিনার খাবেন কখন?'

'একজন গেস্ট আসবার কথা। তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি। ও! আপনি তো তাঁকে চেনেন! সমুদ্রবিজ্ঞানী ডঃ উমেশ ঝা।'

'ডঃ ঝা সম্ভবত আপনাকে তাঁর কোয়ার্টারে একবেলা খাইয়েছেন!'

ডঃ পাণ্ডের গাম্ভীর্য কেটে গেল। 'ঠিক ধরেছেন। তবে সেজন্যও না. ওঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আলোচনা করারও দরকার আছে। গোপন কিছু নয়। জেলি ফিশ সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য ডঃ ঝা এখানে পেয়েছেন। আপনি নিশ্চয় জানেন, জেলি ফিশে মানুষের চামড়ার পক্ষে ক্ষতিকর উপাদান প্রচণ্ড! তো-- বাহ্! ডঃ ঝা এসে গেছেন। উঠলুম কর্নেল সরকার!'

খোলা বিশাল দরজা দিয়ে দেখলুম, একটা গাড়ি এসে হোটেলের লনে ঢুকল। রোগা ঢ্যাঙা এক ভদ্রলোক ব্রিফকেস হাতে নামলেন। গাড়িতে ড্রাইভার আছে। সে গাড়িটা পার্কিং জোনে নিয়ে গেল। ডঃ পাণ্ডে গিয়ে ডঃ ঝায়ের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর দু'জনে ক্যান্টিনহল অর্থাৎ ডাইনিং হলে ঢুকলেন।

কর্নেল বললেন, 'আমরা দশটায় ডিনার খাব জয়ন্ত। নাকি তোমার খিদে পেয়েছে?'

বললুম, 'নাহ্। পকৌড়া এখনও হজম হয়নি।'

কর্নেল চুপচাপ চুরুট টানতে থাকলেন। মিনিট পাঁচেক পরে একটা অটো রিকশা এসে নীচের রাস্তায় দাঁড়াল। দেখলুম, কৌশল্যাদেবী এতক্ষণে ফিরলেন।

লাউঞ্জে ঢুকে উনি কর্নেলকে দেখতে পেয়ে কাছে এলেন। ডঃ পাণ্ডে যে চেয়ারে বসেছিলেন সেটাতেই বসে পড়লেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন, 'হোটেল দ্য শার্কে পরিবেশবিজ্ঞানী ডঃ রঘুবীর আচারিয়ার কাছে আবার গিয়েছিলুম। উনি আমাকে বোনের মতো স্নেহ করেন।'

কর্নেল দ্রুত বললেন, 'তাঁকে কি ঘটনাটা জানিয়েছেন?'

'জানাতে বাধ্য হলুম। আমার মাথার ঠিক নেই।'

'ডঃ আচারিয়া কী পরামর্শ দিলেন?'

'উনি বললেন— আপনি যা বলছিলেন, এখনই হঠাৎ করে পুলিশকে জানাতে নিষেধ করলেন। পুলিশ হইচই বাধাবে এখানে এসে। আর মুখ নিচু করে কৌশল্যা আরও আস্তে বললেন, 'উনি আপনার সাহায্য নিতে পরামর্শ দিলেন। ডঃ আচারিয়ার থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দিল্লীতে একটা বড়ো সেমিনার হবে। ওঁর থাকা খুবই নাকি জরুরি। উনি কাল বারোটা পাঁচের ট্রেনে চলে যাচ্ছেন। তো ডঃ হাজরা ফিরেছেন?'

'নাহ্।'

কৌশল্যার মুখে হতাশার ছাপ ফুটে উঠল। 'তা হলে মেয়েটা পালিয়ে গেছে। পুলিশকে বললে হয়তো ওরা রেল স্টেশন বা বাসস্টেশনে লক্ষ্য রাখতে পারত। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।'

'আচ্ছা কৌশল্যাদেবী, আপনি কি শ্রাবন্তীর সঙ্গে কোনো যুবককে কোনো সময় দেখেছেন?'

কৌশল্যা তাকালেন। একটু পরে বললেন, 'না তো! তবে সমুদ্রবিজ্ঞান ভবনে কনফারেন্সের প্রথম দিন দুপুরে ব্যুফে লাঞ্চের সময় এক যুবক শ্রাবন্তীর আগে ছিল। সে পেছন ফিরে শ্রাবন্তীর প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছিল দেখেছি। এটা ভদ্রতা হতে পারে। কেন?'

'আর কোনো সময়ে যুবকটিকে দেখতে পাননি?'

'হ্যাঁ। কনফারেন্স হলে তাকে বসে থাকতে দেখেছি। আমি ভেবেছিলুম কোনো সাংবাদিক। তার হাতে প্যাড আর কলম ছিল। জয়ন্তবাবু চিনতে পারেন।'

বললুম, 'নাহ্। কলকাতা থেকে যে-সব সাংবাদিক এসেছিল, সবাই আমার চেনা। তা ছাড়া আমাদের জন্য আলাদা প্রেস লেখা জায়গা ছিল। তাকে কি সেখানে দেখেছিলেন?'

'না। আমন্ত্রিত শ্রোতাদের আসনে দেখেছি।'

'তা হলে সে সাংবাদিক নয়।'

'বেশ স্মার্ট চেহারা। ফিল্ম হিরোর মতো দেখতে।'

কর্নেল বললেন, 'চলো জয়ন্ত! ডিনার সেরে নেওয়া যাক। কৌশল্যাদেবী! আপাতত আমাদের টেবিলে যোগ দেবেন চলুন। এখন মাথা ঠিক রাখা দরকার। প্লিজ, কাকেও যেন জানতে দেবেন না। কী ঘটেছে। আসুন! স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করুন।'

ক্যান্টিনহলে গিয়ে শেষপ্রান্তে চারজনের বসার জায়গা পাওয়া গেল। পাশে খোলা জানালা। সামুদ্রিক হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। কারণ পূর্বাচল উঁচু জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেলের দাড়ি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। তবু তিনি জানালা বন্ধ করলেন না।

চুপচাপ আমরা ডিনার খেয়ে উঠে পড়লুম। কৌশল্যা বর্মন বললেন, 'আমি স্যুইটে যাই। কাপড় চোপড় বদলাতে হবে। দরকার হলে আমরা পরস্পরকে টেলিফোন করব।'

পাণ্ডে এবং ঝা তখনও ডিনার শেষ করেননি। দুজনেই কথা বলছেন আর একটু-আধটু করে খাচ্ছেন। আমাদের ওঁরা লক্ষ্য করলেন না।

সিঁড়িতে দেখা হল মালবিকা হাজরার সঙ্গে। কর্নেল বললেন, 'ডঃ হাজরাকে

দেখছি না?'

মালবিকা গম্ভীর মুখে বললেন, 'ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টকে সি-বিচে খুঁজে বেড়াচ্ছে

'বলেন কী? দেখতে পেয়েছেন বুঝি?'

'সি-বিচে আলো আছে, দেখতে পাওয়া যায়।'

'গেল কোথায় মেয়েটি?'

'নরকে।' বলেই মিসেস হাজরা দ্রুত নেমে গেলেন।

আমাদের স্যুইটে ঢুকে হাসতে হাসতে বললুম, সম্ভবত তাঁর স্বামী সঙ্গে শ্রাবন্তীর অবৈধ সম্পর্কের কথা জানেন।'

কর্নেল চুরুট জ্বেলে কী জবাব দিতে ঠোঁট ফাঁক করেছেন, বন্ধ দরজায় জোরালো ধাক্কার শব্দ হল। দরজা খুলতেই ডাঃ কৌশল্যা বর্মন ঝোড়ো কাকের মূর্তিতে ঘরে ঢুকে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠলেন, 'মার্ডার! কর্নেল সরকার, আমার স্যুইটের বাথরুমে মার্ডার!'

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দু'কাঁধে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'শ্রাবন্তীর ডেডবডি?'

ঝাঁকুনিতে কৌশল্যাদেবীর উন্মাদিনীর ভাবটুকু ঘুচে গেল। ভাঙা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ। শ্রাবন্তীর ডেডবডি! বীভৎস দৃশ্য কর্নেল সরকার। চিত হয়ে পড়ে আছে। চোখ খোলা। আমি বাথরুমের দরজা ঠেলছিলুম। খুলছিল না। শেষে জোরে ঠেলার পর দরজা একটু ফাঁক হল। অমনি দেখলুম-- হা ঈশ্বর! এবার আরও সর্বনাশ হল!'

কর্নেল বললেন, 'আপনি এখানে চুপচাপ বসুন। জয়ন্ত! তুমি থাকো। আমাকে আপনি চাবি দিন!'

কৌশল্যা বললেন, 'চাবি তো বিছানায় ফেলে এসেছি।'

'তাহলে দরজা খোলা যাবে না। আমি ম্যানেজারকে ডুপ্লিকেট চাবি আনতে বলছি।' বলে কর্নেল টেলিফোন ডায়াল করলেন। সাড়া এলে বলেন, 'স্যুইট নাম্বার সেভেন থেকে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। ম্যানেজার মিঃ মহাপাত্রকে দিন। .. মিঃ মহাপাত্র! আমি কর্নেল সরকার বলছি। তিনতলায় ১৭ নম্বর স্যুইটের ডুপ্লিকেট চাবি.. ও হ্যাঁ! দুই বোর্ডারকে দিয়েছেন। ... তা হলে মাস্টার কি নিয়ে এখনই আসুন আমি আমার দরজার সামনে অপেক্ষা করছি। ...হ্যাঁ। একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এখন কোনো উত্তেজনা বা হইচই নয় প্লিজ! শুধু আপনি আসুন মাস্টার কি নিয়ে। ... ধন্যবাদ।'

দরজা খোলা রইল। একটু পরে দেখলুম মিঃ মহাপাত্র হন্তদন্ত এসে গেলেন তারপর দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন।

কৌশল্যাদেবীকে বললুম, 'আপনি বরং ব্যালকনিতে গিয়ে বসুন। সিঁড়ি দিয়ে

বোর্ডার বা হোটেলবয়রা ওঠানামা করতে পারে। আপনাকে এভাবে এখানে বসে থাকতে দেখে তাদের কৌতূহল হতে পারে।'

কৌশল্যা রুমালে চোখ মুছে ব্যালকনিতে গিয়ে বসলেন। আমি দরজার দিকে ঘুরে বসে সিগারেট ধরালুম।

একটু পরে ডঃ বিক্রমজিৎ পাণ্ডে আপনমনে এসে সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় নিজের ঘরে চলে গেলেন। এ ঘরের দিকে তাকালেন না।

পাঁচ মিনিট পরে কর্নেল এবং মিঃ মহাপাত্র ফিরে এলেন। কর্নেল তাঁকে বললেন, 'যে নাম্বার দিলুম, ওটা ও সি রণবীর জেনার ব্যক্তিগত নাম্বার। আমার নাম করে বলবেন কী ঘটেছে এবং তিনি যেন সম্ভব হলে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর কল্যাণ পট্টনায়ককে সঙ্গে নিয়ে আসেন। আমার ঘর থেকে সরাসরি বাইরে ফোন করা যাবে না। পি বি এক্স অপারেটর চমকে উঠবে। কাজেই ...'

'ও কে কর্নেল সরকার।' বলে ম্যানেজার নেমে গেলেন।

কর্নেল দরজা এঁটে ব্যালকনিতে গিয়ে কৌশল্যাদেবীকে স্যুইটের চাবি এবং আরো এক গোছা চাবির রিং দিয়ে বললেন, 'একটা কথা। আপনার চুরি সম্পর্কে পুলিশকে আজ রাতে কিছু বলবেন না। আপনি বলবেন, বিকেলে সি-বিচ থেকে ফিরে স্যুইটে ঢুকেছিলেন। কিন্তু বাথরুমে যাননি। তারপর নিচে গিয়ে ডঃ হাজরাকে বলেন, শ্রাবন্তীকে দেখতে পাচ্ছেন না। সে আপনার স্যুইটে থাকে। কাজেই তার খোঁজ আপনি নিতেই পারেন। তারপর আপনি হোটেল দ্য শার্কে ডঃ আচারিয়ার কাছে একটা ব্যক্তিগত মেসেজ দিতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে ডিনার করে- হ্যাঁ, এর পরের অংশটা ঠিক-ঠাক বলবেন।'

কৌশল্যাদেবী রুমালে আবার চোখ মুছলেন। 'আমি ভাবতে পারিনি এমন কিছু ঘটবে।'

'ঘটে যখন গেছে, ঠাণ্ডা মাথায় তার মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে।'

বলে কর্নেল এসে বসলেন। চুরুট ধরিয়ে আস্তে বললেন, 'খুনী শ্রাবন্তীর গলায় নাইলনের দড়ির ফাঁস আটকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেছে। দড়িটা লম্বা। আমার ধারণা শাওয়ারে তাকে ঝুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল-- যাতে আত্মহত্যা বলে মনে হয়। খুনী পারেনি। শ্রাবন্তী ছিপছিপে গড়নের মেয়ে। ততকিছু ওজন নয় তার শরীরের। আমার অনুমান পঞ্চাশ কিলোগ্রামও ওজন নয়। বড় জোর পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ কেজি।'

'নাইনলের দড়িটা কি এখনও গলায় জড়ানো আছে?'

'হ্যাঁ। ঝোলানোর চেষ্টা করেছিল কোমোডে উঠে। কোমোডের নীচে বালি পড়ে আছে। জুতো খুলে রেখে কোমোডে চড়েছিল খুনী। ব্যর্থ চেষ্টার পর পালিয়ে যায়।

দরজা তো ভেতর থেকে খোলা যায়। দরজার সামনে একই বালি। অবশ্য আমাদের অনেকের জুতোর তলায় সামুদ্রিক বালি ছিল।'

'আমার ছিল না।'

কর্নেল হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'হ্যাঁ। তুমি এ বেলা বেরোওনি।'

আস্তে বললুম, 'কর্নেল! মিসেস হাজরা খুনী নয় তো?'

'হতেই পারেন। তবে যতক্ষণ না কোনো প্রমাণ পাচ্ছি, চুপচাপ থাকাই উচিত।' কর্নেল একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'অদ্ভুত! আমার ইনটুইশনের বড়াই করি। অথচ তখন কৌশল্যাদেবীর খাটের তলায় উঁকি দিলুম। বাথরুমে গেলুমই না। এমন তো হতেই পারে, আমরা ঘরে ঢোকার সময় খুনী বাথরুমের দরজা বন্ধ করে তখনও ভেতরেই ছিল। আসলে তখন ফাইল চুরির ব্যাপারটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলুম।'

'শ্রাবন্তীর খোঁপা লক্ষ্য করেছেন?'

'খোঁপার যেটুকু দেখতে পেয়েছি, তাতে বুঝেছি, ফুলগুলো সে বাইরে কোথাও ফেলে দিয়ে এসেছিল। শুধু দুটো ফুল খোঁপায় আটকে ছিল। একটা পড়েছিল ব্যালকনিতে। একটা খাটের পাশে।'

'সে তো দেখেছি, আপনি কুড়িয়ে নিলেন।'

'এবার বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটা ঘরে ফিরে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে খুনীর সঙ্গে কথা বলছিল। খুনী তাকে ভেতরে কোনো ছলে ডেকে আনে। তারপর ব্যালকনির দরজা ভেজিয়ে দেয়। সম্ভবত কোনো গোপন কথা আলোচনার ছল করেছিল।'

'মেঝের কার্পেট লক্ষ্য করেছেন?'

'খুন করেছে মেঝেতে। দুই খাটের মধ্যিখানে। কিন্তু নারকেল ছোবড়ার কার্পেট মেঝের সঙ্গে সেঁটে আছে দেখে এলুম। শুধু একটুখানি জায়গা কুঁচকে আছে। ওটা তখন কৌশল্যা দেবীর সঙ্গে গিয়েও লক্ষ্য করেছিলুম। কিন্তু গুরুত্ব দিইনি। এই দেখ, জুতোর ডগা দিয়ে কার্পেটটা একটু কুঁচকে দিলুম। লক্ষ্য করছ? গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে কি দেখলে পরে?'

'নাহ্।'

কর্নেল ডাকলেন, 'ডঃ বর্মন! ঘরে এসে বসুন এবার।'

কৌশল্যাদেবী ঘরে এসে কর্নেলের বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসলেন। তাঁকে এখন শান্ত এবং কিছুটা নির্বিকার দেখাচ্ছিল। বললেন, 'আমি আপনার মেয়ের বয়সী কর্নেল সরকার। আমাকে আপনি নাম ধরে ডাকবেন।'

কর্নেল শান্তভাবে হাসলেন। 'ঠিক আছে। তুমি আমার মেয়ে। তবে আমি চিরকুমার। সামরিক জীবন আমাকে যদি গিলে না খেত, তা হলে আমি হয়তো বিয়ে করতুম এবং আমার মেয়ে জন্মালে এতদিনে তোমার বয়সী হত। তুমি— আমার

অনুমান, বড়জোর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী।'

কৌশল্যা মুখ নামিয়ে বললেন, 'আমি এ মাসে পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে ছত্রিশে পড়েছি।'

'জয়ন্ত! দেখ, কেমন নির্ভুল আমার হিসেব। তুমি কত ভেবেছিলে?'

বললুম, 'আমার অনুমান ছিল কৌশল্যাদেবীর বয়স তিরিশের বেশি নয়।'

কৌশল্যা বললেন, 'আমি বাংলা বলতে পারি না। যদিও আমার জন্ম হয়েছিল ত্রিপুরার আগরতলায়। আমি বড়ো হয়েছি দিল্লিতে মামার বাড়িতে। আমার মামা জগদীপ সিনহাকে আপনি ভালো চেনেন। তিনি আপনার বন্ধু। তাই না? তো মামী মার্কিন মহিলা। তাই আমার বাংলা শেখা হয়নি। আর জয়ন্তবাবু! আপনি আমাকে কৌশল্যাদিদি বললে খুশি হবো।'

কর্নেল শুধরে দিলেন। 'বাঙালিরা কৌশল্যাদি বলবে। দিদি অবশ্য সম্ভাষণে।'

টেলিফোন বাজল। কর্নেল দ্রুত রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। 'মিঃ মহাপাত্র? ... মিঃ জেনা আসছেন? ... মিঃ পটনায়ক? ঠিক আছে। ... একটা হইচই উত্তেজনা তো হবেই। হত্যাকাণ্ড। না, না। আপনি কী করতে পারতেন? কোনো সমস্যাই নয়। পুলিশ এলে বোর্ডাররা জানবে। অনেকে অবশ্য দরজা এঁটে শুয়ে পড়েছেন। কাজেই তত কিছু ভিড় হবে না। ডঃ হাজরা এইমাত্র ফিরলেন? ঠিক আছে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী খেয়ে নিন। এখন ওঁদের কিছু বলবেন না। যথাসময়ে পুলিশই ওঁদের জানাবে। ঠিক আছে। কোনো চিন্তার কারণ নেই। রাখছি।'...

কর্নেল উঠে গিয়ে দরজা খোলা রাখলেন। বললুম, 'কী ব্যাপার? দরজা—'

বৃদ্ধ রহস্যভেদী আমার কথার ওপর বললেন, 'স্পিকটি নট। চুপচাপ বসে থাকো।'

দু-তিন মিনিটের মধ্যেই ডঃ পরিমল হাজরা এবং তাঁর স্ত্রী মালবিকা হাজরাকে দরজার সামনে দেখা গেল। মালবিকা আমাদের ঘরের দিকে না তাকিয়ে চটির শব্দ তুলে চলে গেলেন। ডঃ হাজরা থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, 'একটু কথা কর্নেল সায়েব!'

কর্নেল বললেন, 'স্বচ্ছন্দে ভেতরে এসে কথা বলতে পারেন।'

একটু দ্বিধার সঙ্গে পরিমল হাজরা ঘরে ঢুকলেন। কৌশল্যাদিকে দেখে ইংরেজিতে বললেন, 'আপনি আছেন এখানে? ভালোই হল। আপনি তখন শ্রাবন্তীকে

কৌশল্যাদি বললেন, 'খুঁজছিলুম— মানে, তাকে অনেকক্ষণ আমার ঘরে বা নীচে কোথাও দেখিনি। তাই একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম। সে একজন যুবতী মেয়ে।'

'ফিরেছে কি শ্রাবন্তী?'

'না। সে ফিরে এলে এখানে কেন আড্ডা দেব?'

'আমি কোথাও তাকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে এলুম। ভাবলুম, এতক্ষণে নিশ্চয় ফিরেছে। মালবিকা বলছিল, না ফিরে থাকলে আপনি হোটেলের ম্যানেজারকে নিশ্চয় জানাতেন। ম্যানেজার কার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত দেখে চলে এলুম। রাত এগারোটা কখন বেজে গেছে।'

'আপনি আমার কথা শুনে তখন সর্বনাশ বলে ছুটে গেলেন কেন জানতে পারি?'

ডঃ হাজরা আস্তে বললেন, 'এখানে শ্রাবন্তী আমার সঙ্গে আসার পর অচেনা-অজানা এক যুবককে গায়ে পড়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে দেখেছিলুম। বখাটে ধরনের যুবক। তাই ভেবেছিলুম, শ্রাবন্তী তার ছলনায় পড়ে সি-বিচে গেছে। আজকাল তো সর্বত্র মানে, নারীধর্ষণ আর খুন-খারাপি হচ্ছে। তাই আমার প্রচণ্ড আতঙ্ক জেগেছিল। ওই বখাটে ছোকরার ফাঁদে পা দিয়ে শ্রাবন্তী হয় তো বিপদে পড়েছে।'

কর্নেল বললেন, 'ডঃ হাজরা! কিছু মনে করবেন না। বিকেলে দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের কাছে আপনি আর শ্রাবন্তী পাশাপাশি বসেছিলেন। আমি দেখেছি।'

কৌশল্যাদি বললেন, 'আমিও দেখেছি। আপনি তার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিচ্ছিলেন।'

ডঃ হাজরা নিমেষে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'নিশ্চয় আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে এখনও শ্রাবন্তী ফিরে এল না। আপনি পুলিশকে জানাননি কেন?'

'এখনই স্যুইটে ফিরে জানাচ্ছি। আমি আপনার পরামর্শ নিতে চেয়েছিলুম।'

ঠিক এই সময় সিঁড়িতে কয়েক জোড়া জুতোর শব্দ হল। তারপর কয়েকজন পুলিশকে দেখা গেল। একজন পুলিশ অফিসার কর্নেলকে দেখে বলে উঠলেন, 'এই যে কর্নেল সরকার! চলুন। লাশটা দেখি।'

লক্ষ্য করলুম, ডঃ হাজরা পাথরের মূর্তিতে পরিণত।

।। তিন ।।

এযাবৎ কর্নেলের সঙ্গী হয়ে অনেক খুন-খারাপি দেখেছি। তা ছাড়া সাংবাদিকদের তো কত বিচিত্র বা বীভৎস্য দৃশ্য দেখতে হয়। তাই শ্রাবন্তীর মৃতদেহ দেখে তৎক্ষণাৎ আমার মনে কোনো বিকার জাগেনি। পুলিশের সঙ্গে ফোটোগ্রাফার এবং ডাক্তার এসেছিলেন। ফোটোগ্রাফার যথারীতি বাথরুমে ঢুকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ক্যামেরার শাটার টিপছিলেন। ফ্ল্যাশবাল্‌ব্ ঝিলিক দিচ্ছিল। তারপর ডাক্তার লাশ পরীক্ষা করে শ্রাবন্তীকে মৃত ঘোষণা করেছিলেন। ডঃ হাজরা কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। তিনি লাশ

শনাক্ত করেছিলেন। কৌশল্যাদিও পুলিশের কাছে কর্নেলের কথামতো বিবৃতি দিয়েছিলেন। তারপর ও সি মিঃ জেনা এবং ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ পটনায়ক স্যুইটের ভেতরটা তন্নতন্ন খুঁজে কোনো ক্লু বের করার চেষ্টা করেছিলেন। জানি না তাঁরা কিছু পেয়েছিলেন কি না। ব্যালকনিতে গিয়ে দুই পুলিশ অফিসার কর্নেলের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলার পর ম্যানেজার মিঃ মহাপাত্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কাল সকাল ন'টা পর্যন্ত হোটেলের কোনো বোর্ডার যেন চেক-আউট না করেন-- তা তিনি যে-ই হোন বা তাঁর ট্রেন-বাস ফেল হোক। রাতভর হোটেল ঘিরে পাহারা দেবে পুলিশবাহিনী।

ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্সে শ্রাবন্তীর লাশ চালান দেওয়া হয়েছিল। কৌশল্যাদি ওই স্যুইটে থাকতে পারবেন না বলায় ম্যানেজার দোতলায় একটা খালি সিঙ্গল স্যুইটের ব্যবস্থা করেছিলেন। নীচের লাউঞ্জে পুলিশ অফিসারদ্বয় ডঃ হাজরাকে একান্তে ডেকে তাঁর বিবৃতি নেওয়ার পর তিনি তিনতলায় তাঁর ১৯ নম্বর স্যুইটে চলে যান। শ্রাবন্তীর বাড়ির ঠিকানা তাঁর কাছে জেনে পুলিশের পক্ষ থেকে কলকাতায় খবর যাবে।

শ্রাবন্তীর বিছানায় বালিশের তলায় তার পার্স ছিল। কিন্তু স্যুইটের ডুপ্লিকেট চাবি পাওয়া যায়নি। স্যুইটের দরজায় ইন্টার লকিং সিস্টেম। তাই চাবি ঢোকানোর ছিদ্র ও সি মিঃ জেনা গালা দিয়ে বন্ধ করে সিল করে দিয়েছিলেন। দরজার সামনে দু'জন কনস্টেবল দুটো চেয়ারে বসে বাকি রাতের জন্য পাহারা দিচ্ছিল। অত রাতে শ্রাবন্তীর ব্যাগেজ পরীক্ষার মেজাজ ছিল না পুলিশের।

রাত সাড়ে বারোটায় কর্নেল আর আমি নিজেদের স্যুইটে ফিরে শুয়ে পড়েছিলুম। আমার ঘুম আসতে চাইছিল না। বারবার জীবিত শ্রাবন্তীকে মনে পড়ছিল। তাকে তত খুঁটিয়ে লক্ষ্য না করেও এটুকু বুঝতে পেরেছিলুম ওই ছিপছিপে গড়নের মোটামুটি সুন্দরী মেয়েটি মেধাবী এবং নিশ্চয় আণবিক জীববিজ্ঞানে তার উচ্চস্তরের ডিগ্রি আছে। হয়তো নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। অনেক লড়াই করে তাকে মাথা তুলতে হয়েছিল। ডঃ হাজরা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। তাঁর সহকারী হওয়ার যোগ্যতা তো তার থাকার কথা। হ্যাঁ-- ডঃ হাজরার চরিত্রদোষ আছে। প্রায় বাবার বয়সী এই বিজ্ঞানীর পাল্লায় পড়ে হতভাগিনী শ্রাবন্তীকে অনেক বজ্জাতি হাসিমুখে সহ্য করতে হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, সে কেরিয়ারের স্বার্থেই ডঃ হাজরার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে কিংবা চাকরি ছেড়ে দিতে পারেনি।

হঠাৎ কর্নেলের একটা কথা মনে পড়েছিল। পাগলাবাবুকে কফি খাইয়ে এসে কথাপ্রসঙ্গে কর্নেল বলছিলেন যে, কারো ব্যাপারে তাঁর নাক গলানোর ইচ্ছে নেই। তারপর আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি কোন বিজ্ঞানী কোথায় ঘুরছেন, সেই বিবরণ দিয়ে প্রশ্নটা প্রকারান্তরে চেপে দিয়েছিলেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয় তাঁর চোখে অর্থাৎ বাইনোকুলারে কোনো রহস্যজনক ব্যাপার ধরা দিয়েছিল।

তারপর কৌশল্যাদির গুরুত্বপূর্ণ ফাইল উধাও হয়ে গেল এবং বাথরুমে শ্রাবন্তীর লাশ দেখা গেল।

ধুরন্ধর বৃদ্ধকে কাল সকালে উত্যক্ত করতেই হবে। তার চেয়ে বড় অদ্ভুত ব্যাপার, এখানে আসার পর কিংবা হয়তো কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার আগেই তিনি স্থানীয় পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। কেন?

কেউ দরজায় নক করছিল। উঠে বসে দেখি, খোলা ব্যালকনি দিয়ে ঝলমলে রোদ ঢুকছে ঘরে। সাতটা বাজে। কখন ঘুম এসেছিল কে জানে! কর্নেলের বিছানা খালি। দরজা খুললে হোটেল বয় নব বেডটি দিয়ে গেল। বললুম, 'নীচে কী হচ্ছে নব?'

নব বলল, 'পুলিশ বোর্ডারদের একে-একে ডেকে জেরা করছে। নাম-ঠিকানা জেনে নিচ্ছে। স্যার! এমন ঝামেলা পূর্বাচলে কখনও হয়নি।'

'কর্নেলকে দেখেছ?'

'উনি ভোরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ অফিসাররা ওঁকে বেরুতে বাধা দেয়নি।'

'অন্যদের বেরুতে দিয়েছে?'

'না স্যার! আপনাদের দু'জনকে নিয়ে মোট এগারোজন বোর্ডার। দোতলা থেকে চারতলায় সিঙ্গল আর ডাবল স্যুইট মিলে মোট বারোটা। তিনতলার ১৭ নম্বর এখন খালি। দরজায় পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।'

'বোর্ডাররা কি ক্যান্টিনে এখন?'

'কেউ কেউ ক্যান্টিনে, কেউ-কেউ লনে বসে আছেন।'

'ঠিক আছে। তুমি এস।'

নব পা বাড়তে গিয়ে ঘুরল। আস্তে বলল, 'একটা কথা পুলিশকে বলতুম। কিন্তু ম্যানেজার সায়েব বলেছেন, হোটেলের কোনো স্টাফ কোন বেফাঁস কথা পুলিশকে না বলে। তাই বলিনি। কিন্তু আপনি কর্নেল সায়েবের সঙ্গে এসেছেন। আপনাকে বলছি। কর্নেল সায়েবকে বলার হয়তো সুযোগ পাব না। আপনি আমার হয়ে বলবেন. তবে স্যার, আমি সামান্য স্টাফ। কথাটা যে আমিই বলেছি, তা যেন পুলিশের কানে না যায়!'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করে বলতে পারো।'

নব উঁকি মেরে দরজার বাইরে করিডর দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কাল সন্ধ্যার একটু আগে যখন বৃষ্টি পড়ছিল, তখন খুন হয়ে যাওয়া ভদ্রমহিলা ভিজতে ভিজতে লাউঞ্জে এসে ঢুকলেন। তাঁর পেছন-পেছন আপনার বয়সী এক ভদ্রলোক

ঢুকল। তারপর দু'জনে রিসেপশনে গেল। আমি রিসেপশনে বোর্ডারদের অর্ডার মতো চা-কফি-পাকৌড়ার স্লিপ নিচ্ছিলুম। কানে এল ভদ্রমহিলা বলছেন, আপনাদের একটা সিঙ্গল স্যুইট খালি আছে দোতলায়। সেটা এঁকে দিন। রিসেপশনে কমলাদি আর দাসবাবু ছিল। তারা বলল, ওটা রিজার্ভ আছে। দেওয়া যাবে না। ভদ্রলোক চলে গেল।

জিজ্ঞেস করলুম, 'সিঙ্গল স্যুইটটা কি সত্যি রিজার্ভ ছিল? ওখানে তো গতরাত থেকে কৌশল্যাদি আছেন।'

নব বলল, 'সেই কথাটাই তো বলছি স্যার! ওই ভদ্রলোককে নাকি কমলাদি আর দাসবাবু দু'জনেই চেনে। দু'জনেই বলছিল, লোকাল ছেলে। নিউ চন্দনপুর টাউনশিপে বাড়ি ওর। স্ফূর্তি মারতে চায়। মহিলা ওর পাল্লায় পড়েছে। সাবধান করে দিতে হবে।'

নব চলে গেলে শ্রাবন্তীর যে ইমেজ মনের ভেতর গড়ে তুলেছিলুম, তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। শ্রাবন্তী কি তা হলে খারাপ মেয়ে ছিল?

দরজা বন্ধ করে ব্যালকনিতে বসলুম। চা শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে নীচের লনে উঁকি দিলুম। দেখলুম, ডঃ পাণ্ডে তাঁর বয়সী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বেঞ্চে বসে কথা বলছেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও কয়েকজন পুরুষ ও নারী। কেউ পায়চারি করছেন। কেউ গম্ভীর মুখে বসে আছেন।

মেঘ ফুঁড়ে সূর্য নরম রোদ ছড়াচ্ছে। এখন হাওয়া কম। তবু এখানকার সমুদ্র সবসময় বিক্ষুব্ধ। দূরে সমুদ্রের জলে রোদ প্রতিবিম্বিত হয়ে তরল সোনার লাবণ্যে পরিণত। অনেক দূরে একটা সাদা জাহাজ একবার দেখা দিচ্ছে, একবার ঢেউয়ের আড়ালে ঢাকা পড়ছে। বিচে এবং ডানদিকের বালিয়াড়িতে যারা আছে, তারা অন্য সব হোটেলের লোক।

একটু পরে বাঁদিকে দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের উত্তরপ্রান্তে বৃদ্ধ প্রকৃতিবিজ্ঞানীকে আবিষ্কার করলুম। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে খাড়ির নীচে ব্যাকওয়াটার দেখছেন মনে হল। তারপর চোখে পড়ল কাল বিকেলে দেখা একই দৃশ্য। পাগলাবাবু গাধাটার পেছনে লেগেছেন। গাধাটা উত্ত্যক্ত হয়ে কেয়াঝোপের ভেতর ঢুকে গেল। পাগলাবাবুও ঢুকলেন। তারপর সম্ভবত কালকের মতো গাধাটার লাথি খেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। পিচ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তিনি আঙুল তুলে হুমকি দেওয়ার পর কর্নেলকে দেখতে পেলেন। অমনি ঝোপঝাড় কাশবনের ভেতর দিয়ে চড়াই ভেঙে তিনি কর্নেলকে সহাস্যে কিছু বলে হাত বাড়ালেন। অবাক হয়ে দেখলুম, কর্নেল তাঁর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন।

তাঁদের ওপর সরাসরি রোদ পড়ায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

পাগলাবাবু কর্নেলকে দু'হাত নেড়ে কিছু বোঝাচ্ছিলেন। তারপর কর্নেল সোজা

ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নেমে এলেন। পাগলাবাবু তাঁর পেছনে। একটু পরে ওখানে উঁচু ও ঘন কেয়াবনের ভেতর দু'জনেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

খানিক পরে দু'জনকে পিচরাস্তায় দেখতে পেলুম। হোটেলের নীচে বাঁদিকে রাস্তার ধারে বিচে যাওয়ার পথের সঙ্গমস্থলে রোডসাইড কাফে। কর্নেল পাগলাবাবুকে এক কাপ কফি দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে হোটেলের গেটে এলেন।

গেটের নীচে পুলিশভ্যান এবং গেটে পুলিশ প্রহরী। কর্নেলকে তারা স্যালুট ঠুকল। তারপর কর্নেল হোটেলের নীচে অদৃশ্য হলেন।

কিন্তু তিনি ওপরে এলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে কফি পান শেষ করে পাগলাবাবু পেপার কাপটিকে কিক করে দূরে ফেললেন। তারপর শুরু হল তাঁর নাচ-গান :

'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
মাইরি রাতি পোহাইল
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল
মাইরি সকলি ফুটিল
পাখি সব করে রব, মাইরি বলছি — রাতি পোহাইল'

রোড-সাইড কাফে এবং পুলিশভ্যানের লোকেরা দৃশ্যটা ভিড় করে উপভোগ করছিল।

কিছুক্ষণ পরে নাচ-গান থামিয়ে পাগলাবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ালেন। কেন দৌড়ালেন বুঝতে পারলুম। গাধাটা কেয়াঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে। গাধাটা কি বেওয়ারিশ?

দৃশ্যটা দেখা হল না। দরজায় নক করল কেউ। দু'বার নক মানে কর্নেল। দরজা খুলে দেখলুম, তিনিই বটে। অভ্যাসমতো বললেন, 'মর্নিং জয়ন্ত। আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।'

একটু হেসে বললুম, 'মর্নিং বস্! দুর্গপ্রসাদের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ব্যাকওয়াটারে কি আবার কোনো লাশ দেখছিলেন?'

কর্নেল ক্যামেরা আর বাইনোকুলার টেবিলে রেখে বসলেন। বললেন, 'ব্যাকওয়াটারে জেলেদের মাছধরা দেখছিলাম।'

আস্তে বললুম, 'একটু গোয়েন্দাগিরি করার সুযোগ পেয়েছি। অবশ্য এতে আমার কৃতিত্ব নেই। নবচন্দ্রের ভলান্টারি কনফেসন। কাল সন্ধ্যার আগে বৃষ্টির সময় শ্রাবন্তীর সঙ্গে সেই যুবক—'

আমাকে হতাশ করে ধুরন্ধর রহস্যভেদী বললেন, 'ম্যানেজার মিঃ মহাপাত্র আমাকে জানিয়েছেন। যুবকটি নিউ চন্দনপুরের বাসিন্দা। তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, সে মাছব্যবসায়ী মহীতোষ বিশ্বাসের ভাগনে অমল রায়। কলেজে নাকি কেমিস্ট্রিতে

ভালো রেজাল্ট করেছিল। কিন্তু ফিল্মের নেশায় আর এগোতে পারেনি। সে থাকে ভুবনেশ্বরে। মাঝে মাঝে বাড়ি বেড়াতে আসে। মামার সাহায্যে সে সমুদ্রবিজ্ঞান অফিস থেকে তার ডিগ্রির ডকুমেন্ট দেখিয়ে কনফারেন্সের ডেলিগেট কার্ড জোগাড় করেছিল।'

বললুম, 'ভেবেছিলুম আপনাকে চমকে দেব। আমার দুর্ভাগ্য!'

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, 'এবার তোমাকে একটু চমকে দিই। একটুখানি চমক মাত্র। কৌশল্যার ডাবলবেড স্যুইট অর্থাৎ ১৭ নম্বরের ব্যালকনির ঠিক নীচে ফুলের ঝোপে ডুপ্লিকেট চাবিটা পড়েছিল। ছটায় বেরিয়ে গিয়ে আমি ওটা আবিষ্কার করেছিলুম! এখন দিয়ে এলুম ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ পট্টনায়ককে।'

'ওখানে চাবি কেন ছুড়ে ফেলেছিল খুনী?'

'খুনীর চাবি ছুড়ে ফেলার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। তাই আমার ধারণা, ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে খেলার ছলে চাবিটা শ্রাবন্তী আঙুলের ডগায় নাচাচ্ছিল। হঠাৎ হাত ফসকে পড়ে গিয়েছিল। অনেকের এই চাবি নাচানো অভ্যাস থাকে। তবে এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, খুনী তার সঙ্গেই ঢুকেছিল এবং শ্রাবন্তী সদ্য দরজা খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে লক্ষ্য করছিল কৌশল্যাকে। কারণ কৌশল্যা দুর্গপ্রাসাদ থেকে নেমে রাস্তার উল্টোদিকে হোটেল দ্য শার্কে ডঃ আচারিয়ার সঙ্গে গল্প করছিলেন। তখন বৃষ্টি পড়ছিল।'

'হ্যাঁ। কৌশল্যাদি বলছিলেন মনে পড়ছে।'

'এখন কথা হল, অমল স্যুইট খালি নেই শুনে তখনই বেরিয়ে যায়। রিসেপশনকর্মী কমলাদেবী আর দণ্ডধর দাস অমলকে চেনেন। অমলকে তাঁরা তাঁদের রাত ন'টা পর্যন্ত ডিউটির সময়ে আর দেখতে পাননি। কাজেই অমল খুনী হতে পারে না।' বলে কর্নেল বাথরুমে ঢুকলেন।

একটু পরে তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, 'চলো! আটটা দশ বাজে। ক্যান্টিনে গিয়ে কফি খাওয়া যাক। মহীতোষবাবুকে ভোরবেলা রিসেপশন থেকে ফোনে হোটেলের ঘটনা সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছি। আজকের দিনটা হোটেলেই থাকছি। কাল সকালে ওঁকে ফোনে জানাব, ওঁর বাড়ি যাওয়া হচ্ছে কি না।'

প্যান্ট-শার্ট পরে নিয়ে বললুম, 'পুলিশ বোর্ডারদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে কোথায়?'

'বারের কাছে। হ্যাঁ— ব্যালকনির দরজা বন্ধ করে দাও। ঘরে আমার দামি ক্যামেরা ইত্যাদি আছে।'

'তা দিচ্ছি। তাবে দিনদুপুরে দোতলার ব্যালকনিতে পুলিশের চোখের সামনে চোর ঢুকবে না।'

কর্নেল হাসলেন। সমুদ্র থেকে ভূত এসে ঢুকতে পারে। কত চোর এই সমুদ্রে ডুবে

মরে যে ভূত হয়নি, তা কে বলতে পারে? সেই ভূত সব লণ্ডভণ্ড করে পালাক, এটা ঠিক নয়।'

সিড়িতে নামবার সময় আমার বুদ্ধিসুদ্ধি খুলে গেল। বললুম, 'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে এই সমুদ্র সত্যি ভুতুড়ে হয়ে ওঠে। আচমকা প্রচণ্ড হাওয়া এসে ঘরের জিনিসপত্র উল্টে ফেলে। পরশু অ্যাশট্রেটা উল্টে পড়েছিল। অত ভারি পাথরের অ্যাসট্রে!'

'তুমি বোঝো সবই জয়ন্ত! তবে একটু দেরিতে।'

লাউঞ্জের দক্ষিণপ্রান্তে বারের সামনে পুলিশের রীতিমতো অফিস বসেছে। টেবিলের তিনদিকে তিনটে চেয়ার। ও সি এবং ডিটেকটিভ ইন্সপেকটর দুটো চেয়ারে বসেছেন। একটা চেয়ারে বসে আছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। পরনে টাইস্যুট—সম্ভবত কোনো ব্যবসায়ী বোর্ডার।

ক্যান্টিনে ঢুকে দেখলুম, ডঃ হাজরা এবং পাণ্ডে গম্ভীর মুখে চাপা গলায় কথা বলছেন। মিসেস মালবিকা হাজরা অন্য একটা টেবিলে একা বসে চুলের ক্লিপ দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। চোখ বন্ধ। খুব আরাম পাচ্ছেন মনে হল।

কৌশল্যাদি শেষপ্রান্তের টেবিলে জানালার ধারে একা বসে চা বা কফি পান করছেন। আমাদের চোখের ভাষায় কাছে ডাকলেন। কর্নেলকে দেখে ডঃ পাণ্ডে বললেন, 'কী সর্বনাশ হল দেখুন কর্নেল সরকার! আমি সাড়ে ন'টার ট্রেন মিস করব।'

কর্নেল বললেন, 'আপনার স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়ে গেছে?'

'স্টেটমেন্ট কী বলছেন? জেরা। আর উদ্ভট সব প্রশ্ন। আমি থাকি পাটনায়। আমি কস্মিনকালে শ্রাবন্তীকে দেখিনি। ডঃ হাজরার সঙ্গেও এখানে এসে পরিচয় হয়েছে।'

'জেরা শেষ হলে তো বোর্ডারদের চলে যেতে অসুবিধা নেই! আপনি কি ওঁদের জানিয়েছেন সাড়ে ন'টার ট্রেনে আপনি ফিরবেন?'

'বলেছি। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর সোজা বললেন, সব বোর্ডারের সঙ্গে কথা বলার পর সকলের বক্তব্য একসঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা করা হবে। তারপর আমরা যেতে পারব। আমরা দেখছি কয়েদি!'

ডঃ হাজরা বললেন, 'আমার ট্রেন ছিল আজ সাড়ে বারোটায়। কিন্তু মিসেস বায়না ধরেছেন, দু'দিন থাকবেন।'

কর্নেল বললেন, 'আসলে মার্ডার কেস! পূর্বাচল হোটেলের মালিকরা সুনামহানির ভয়ে সম্ভবত পুলিশের ওপরমহলে চাপ দিয়েছেন। আমার অবস্থাও তা-ই।'

ডঃ পাণ্ডে বললেন, 'তবু তো আপনাকে বেরুতে দিয়েছিল। আপনি রিটায়ার্ড সামরিক অফিসার। অবশ্য আমার কানে এসেছে, আপনি নাকি সি বি আইয়ের সঙ্গে যুক্ত।'

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, 'ভুল শুনেছেন ডঃ পাণ্ডে! তবে এটা ঠিক, কোনো

রহস্যজনক ঘটনা ঘটলে তাতে আমি নাক গলাই।'

ডঃ হাজরা বাঁকা হেসে বললেন, 'আমি কলকাতার লোক। আমি জানি কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের অন্য পরিচয়। কাজেই আশা করছি, আমার ল্যাব-অ্যাসিস্ট্যান্টের খুনী ধরা পড়বে।'

কর্নেল শুধু বললেন, 'দেখা যাক।'

আমরা দু'জনে কৌশল্যাদির টেবিলে গেলুম। কর্নেল তাঁর পাশে বসলেন। আমি উল্টোদিকের চেয়ারে বসলুম। কৌশল্যাদি আস্তে বললেন, 'পুলিশকে সব বোর্ডারের জিনিসপত্র সার্চ করতে বললে আমার ফাইলটা হয়তো পাওয়া যেত।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'খুনী সম্ভবত এত বোকা নয় যে, তোমার ফাইল হোটেলে রেখে দেবে। সে তা বাইরে পাচারের প্রচুর সুযোগ পেয়েছিল। কারণ কাল সন্ধ্যার আগে বৃষ্টির সময় তুমি হোটেল দ্য শার্কে ডঃ আচারিয়ার কাছে গিয়েছিলে।'

কৌশল্যাদির মুখে বিষাদের ছাপ পড়ল। আমি বললুম, 'কৌশল্যাদি! আপনি তো নিজেই রিসার্চ করে ওই ফরমুলা— ফরমুলাই বলছি, উদ্ভাবন করেছেন। কাজেই ফরমুলা আপনার জানা। আপনার ফরমুলা চোর তা নিয়ে মুখ খোলার আগেই আপনি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জানিয়ে দিন যে, এই ফরমুলা আপনার উদ্ভাবিত।'

কৌশল্যাদি তেমনি চাপা স্বরে বললেন, 'আমার উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া খুব সাংঘাতিক। ভারতের কোনো শত্রুরাষ্ট্রের হাতে তা পড়লে ওই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কত ভয়ঙ্কর ভাইরাস ভারতের মাটিতে তারা ছড়িয়ে দেবে। হয়তো রাতারাতি দেখা যাবে দেশের কোথাও কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোটি-কোটি বিষাক্ত পোকামাকড়। তাদের বিষ দ্রুত সংক্রামিত হবে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।'

শিউরে উঠে বললুম, 'কী সর্বনাশ! এ ধরনের গবেষণা করা উচিত হয়নি কৌশল্যাদি!'

'আমি তো ভাবিনি আমার গবেষণা কোথায় পৌঁছবে। জিনোমতত্ত্ব অনুসারে খুদে প্রাণীর কোষের মধ্যে জিন নামক জিনিসে থাকে ডি এন এ অণু। জিনগুচ্ছ কোষে মালার মতো সাজানো থাকে। তা থেকে ডি এন এ নিষ্কাশন করে তার আণবিক গঠন ওলটপালট করে দেখতে চেয়েছিলাম কী দাঁড়ায়। বহু উদ্ভাবন বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যাবে দৈবাৎ হয়ে গেছে। আমি অসহায় জয়ন্ত!'

কর্নেলের ইশারায় নব এল। তাকে তিনি একপট কফি আর বিস্কুট আনতে বললেন। তারপর কৌশল্যাদিকে বললেন, 'সম্মেলনে আরেকজন জিনোমবিজ্ঞানী এসেছিলেন। ডঃ অশোক সাঠে। তিনি তো পরশু বিকেলে চলে গেছেন। ডঃ সাঠে তোমার পেপার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, ভারতের মতো অনুন্নত দেশে ডি এন এ-র গঠন পরীক্ষার মতো সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নেই। ল্যাবরেটরিও নেই। নোবেলজয়ী

বিজ্ঞানী ওয়াটসনের কাজকর্মের স্তরে পৌঁছতে আমাদের দুশো বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

কৌশল্যা বললেন, 'অশোক ব্যঙ্গ করেছিল। সে থাকে বাঙ্গালোরে। আমি দিল্লিতে। কাজেই আমি অনেক বেশি সুবিধা পাই তার চেয়ে। তাছাড়া আমার বাড়িতে নিজস্ব ল্যাব আছে। মামী যখনই তাঁর দেশে যান, আমার কথামতো কিছু-কিছু ল্যাব সরঞ্জাম কিনে আনেন। একটু-একটু করে কোনো সরঞ্জামের খুদে টুকরো আনলে কাস্টমস কিছু টের পাবে না।'

'অশোক সাঠে তোমার পরিচিত মনে হচ্ছিল?'

'খুবই পরিচিত। একসময় সে দিল্লিতে আমার সঙ্গে কাজ করত।'

নব কফির ট্রে রেখে গেল। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, 'অশোক সাঠে ছিলেন হোটেল দ্য শার্কে। ডঃ আচারিয়া এখনও সেখানে আছেন। তুমি রিসেপশনে গিয়ে তাঁকে ফোন করে জেনে নিতে পারো, অশোক সাঠের স্যুইটে যিনি ছিলেন, তিনি চলে গেছেন কি না। অথবা তিনি সিঙ্গল স্যুইটে থাকলে কার সঙ্গে তার বেশি ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করেছেন ডঃ আচারিয়া এবং সেই লোকটি এখনও আছে কি না। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

কৌশল্যাদি তখনই উঠে গেলেন। আমি বললুম, 'ডঃ আচারিয়ার অন্তত একবার এখানে এসে কৌশল্যাদির খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। কাল রাত থেকে এখন পর্যন্ত ভদ্রলোক একবারও সময় পেলেন না এখানে আসার?'

'ফোনে খোঁজখবর নিয়েছেন। কৌশল্যা ভোরে বলছিল।'

'কিন্তু সশরীরে আবির্ভূত হচ্ছেন না কেন?'

কর্নেল ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ছ্যা! ছ্যা! তুমি না সাংবাদিক? লক্ষ্য করোনি তাঁকে? দু'দিন ধরে সম্মেলনে ছিলে তুমি। ফ্যাক্সে কলকাতায় সম্মেলনের খবর পাঠিয়েছ। অথচ সম্মেলনের প্রধান বক্তা পরিবেশবিজ্ঞানী ডঃ রঘুবীর আচারিয়াকে দেখনি?'

'কেন দেখব না? বসে পেপার পড়ছিলেন। বক্তৃতাও দিয়েছিলেন।'

'সবাই দাঁড়িয়ে পড়ছেন। আর উনি বসে কেন, মাথায় এল না?'

'অসুস্থ বুঝি?'

'কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'ডঃ আচারিয়ার একটা পা নেই। ক্রাচে ভর করে চলাফেরা করেন। হিমালয়ে প্রকৃতি পরিবেশের রূপান্তর দেখতে গিয়ে হঠাৎ খাদে পড়ে যান।'

'আমি ওইসব পেপার তত বুঝিনি বলে কারো দিকে তত লক্ষ্য রাখিনি।'

কর্নেল হেসে ফেললেন। 'হায় জয়ন্ত! তুমি যদি শ্রাবন্তীর সঙ্গে ভাব জমাতে পারতে, তাহলে মেয়েটা বেঘোরে প্রাণ হারাত না।'

'আমার তো ফিল্মহিরোর মতো চেহারা নেই। তত স্মার্টও নই।'

এই সময় নীচের রাস্তা থেকে পাগলাবাবুর জোরালো গলার গান শোনা গেল :

'সকলই ফুটিল, ভাই! সকলি ফুটিল
কাননে কুসুমকলি
মাইরি, সকলি ফুটল...'

বললুম, 'এ কী গান! পাগলাবাবুটি আর গান খুঁজে পেল না?'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'গান বা নিছক পদ্য নয় জয়ন্ত! এটা একটা কূটাভাষ। এর নিশ্চয় অর্থ আছে।'

চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকালুম। কর্নেল আর মুখ খুললেন না।

।। চার ।।

কৌশল্যাদি ফিরে এসে বলেছিলেন, ডঃ আচারিয়া বললেন, অশোক সাঠে চার তলায় সিঙ্গল স্যুইটে ছিল। তার সঙ্গে কারো ঘনিষ্ঠতা তিনি লক্ষ্য করেনি। অশোক সাঠে, তাঁর মতে, অহঙ্কারী লোক। কারো সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলত না। তাঁর সঙ্গেও না।'

বেলা নটায় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়েছিল এবং পূর্বাচলের বোর্ডাররা মুক্তি পেয়েছিলেন। ব্রেকফাস্টের পর কর্নেল দুই পুলিশ কর্তার সঙ্গে নীচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন কথা বলছিলেন, তখন আমি আমাদের স্যুইটের ব্যালকনিতে বসে সিগারেট টানছি। ডঃ পাণ্ডেকে দেখলুম, খালি হাতে একটা অটোরিকশাতে চেপে চলে গেলেন। তিনি যে আবার নতুন করে ট্রেনের টিকিট কাটতে স্টেশনে ছুটে গেলেন, তা স্পষ্ট। বেচারার ট্রেনভাড়াটা গচ্চা গেছে। কারণ সাড়ে নটার ট্রেন ততক্ষণে চলে গেছে। রেলস্টেশন এখান থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে। তার ওপর স্টেশনগামী রাস্তাটা গেছে ওল্ড চন্দনপুরের ভেতর দিয়ে। সেখানে যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড় হয়।

কৌশল্যাদি বিষণ্ণভাবে নিজের স্যুইটে ফিরে গেছেন। ডানদিকে ঝাউবন এবং সামনে বিচে রোজকার মতোই ট্যুরিস্টদের চলাফেরা দেখা যাচ্ছিল। তারপর বাঁদিকে দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে পাগলাবাবুকে দেখতে পেলুম। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সমুদ্রদর্শন করছিলেন তিনি। হঠাৎ করজোড়ে সম্ভবত সমুদ্রকে প্রণাম করলেন। নীচের ঘাসজমিতে বেওয়ারিশ গাধাটা নিরুপদ্রবে ঘাস খাচ্ছে।

পুলিশ অফিসাররা তাঁদের বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন। কর্নেল ফিরে এসে নীচে অদৃশ্য হলেন। একটু পরে দরজায় দু'বার নক করার শব্দ হল। দরজা খুলে বললুম,

'পুলিশ এত কাণ্ড করে কিছু ক্লু কুঁজে পেয়েছে কি না বলুন।'

কর্নেল বললেন, 'দরজায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে বলছ বুঝি?'

হেসে ফেললুম। 'না। ভেতরে ঢুকেই বলবেন। আসলে আপনি অতক্ষণ ওঁদের সঙ্গে গুজ-গুজ ফুস-ফুস করছিলেন। তাই আপনাকে সামনে দেখেই প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

দরজা বন্ধ করে চেয়ারে বসে কর্নেল টুপি খুলে টেবিলে রাখলেন। তারপর টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তিনতলার ১৭ নম্বর স্যুইট এখনও বন্ধ এবং দুজন কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছে। কাজেই পুলিশের তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। বোর্ডারদের জেরা করে মিঃ পট্টনায়ক কোনো ক্লু পেয়েছেন কি না, তা আমাকে কেন জানাবেন? উল্টে আমাকেই বলে গেলেন, এবার যেন নিজস্ব পদ্ধতিতে স্বাধীনভাবে তদন্ত করে ওঁদের সাহায্য করি। আশ্চর্য!'

বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। আমি বললুম, 'পাগলাবাবু দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে সমুদ্রকে প্রণাম করছেন দেখলুম। আপনি বলছিলেন, ওঁর ওই গান বা পদ্যটার নাকি বিশেষ কোনো গোপন অর্থ আছে। কেন একথা বলছিলেন জানতে পারি?'

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, 'আজ সকালে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।'

হ্যাঁ ব্যালকনি থেকে দেখছিলুম।'

'আবোল-তাবোল কথাবার্তা বলছিলেন। মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। আমাকে কেয়াবনের ভেতর একটা মজার জিনিস দেখাবেন বলে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, কিচ্ছু নেই। এমনি-এমনি ডেকে ব্লাফ দিলুম। বলেই চোখ নাচালেন। তাঁর গানের মধ্যে নাকি এরকম ব্লাফ নেই। আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে তাঁর গানের মানে। তা হলেই নাকি আমার চোখ খুলে যাবে। যাই হোক, তাঁর নাম-ধাম-পরিচয় জানতে চাইলুম। বললেন, এককাপ কফি খাওয়ালে বলবেন। কফি খাওয়ালুম। কিন্তু ফের ওই পদ্যটা বিদঘুটে সুরে গাইতে-গাইতে নাচ জুড়ে দিলেন।'

'হ্যাঁ। তা দেখছিলুম।'

'আমার কেন যেন মনে হল, এ পাগল সেয়ানা পাগল।'

'এখানকার কেউ ওঁকে চেনে না শুনেছি। হঠাৎ কোত্থেকে এসে জুটেছেন।'

কর্নেল বললেন, 'আমিও খোঁজ নিয়েছি। পাগলাবাবু প্রকৃতি-পরিবেশ সম্মেলনের আগেরদিন এখানে এসেছেন। ভদ্রলোককে রোডসাইড কাফের মালিকই পাগলাবাবু নাম দিয়েছেন। তবে উনি ওই গাধাটা ছাড়া কাকেও উত্ত্যক্ত করেন না।'

'গাধাটা কার কে জানে?'

'নব বলছিল, গাধাটাকে কিছুদিন থেকে এখানে দেখা যাচ্ছে। কে তার মালিক

কেউ জানে না।' বলে কর্নেল চুরুট অ্যাশট্রেতে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। পিঠের সঙ্গে ওঁর কিটব্যাগ এঁটে বললেন, 'তুমি চুপচাপ ঘরে বসে না থেকে এবার বাইরে চলো!'

'আপনার কিটব্যাগ থেকে প্রজাপতিধরা জালের স্টিক বেরিয়ে আছে। এই রোদে প্রজাপতির পেছনে ঘুরবেন। আর আমাকে কোথাও খামোকা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সি-বিচে ঘুরতেও আমার গা ছমছম করে। যা ঢালু বিচ! মনে হয়, এখনই সমুদ্র এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে নিয়ে যাবে।'

'সমুদ্র কিছু নেয় না। নিলেও ফিরিয়ে দেয়। অবশ্য জ্যান্ত জয়ন্ত চৌধুরিকে নিয়ে একটু পরে মৃত জয়ন্ত চৌধুরিকে ছুড়ে ফেরত দেবে।'

'তা হলে?'

'সি-বিচে তুমি নামবে না। আমিও না। ডানদিকে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে কিছুদূর গিয়ে আমরা পোড়ো লাইটহাউসের পেছনে নামব। ওখানে একটা জঙ্গল আছে। প্রচুর বুনো ফুল ফোটে। হ্যাঁ-- ফুল যেখানে, প্রজাপতি সেখানে। তবে তোমার দৃষ্টিশক্তি থাকলে কোনো প্রেমিক-প্রেমিকাকে আবিষ্কার করতেও পারো।'

'কী যে বলেন! লুকিয়ে প্রণয়লীলা দেখতে বলছেন?'

'আহা! ইচ্ছে না হলে লাইটহাউসের চুড়ো দেখবে। চলো! বেরিয়ে পড়ি।'

কিছুক্ষণ পরে বালিয়াড়ির ওপর ঝাউবনে কয়েকজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাকে পেরিয়ে গিয়ে ফাটল ধরা প্রাচীন লাইটহাউসটি চোখে পড়ল। তার পেছন দিকে ঘন উঁচু-নিচু গাছ আর ঝোপ-ঝাড়। ঝোপের ভেতর বড়-বড় পাথর পড়ে আছে। একটু দূরে উত্তরদিকে একটা টিলার মাথায় মন্দির দেখা গেল। লাইটহাউসটা আমার দেখা। তবে এত কাছে আসিনি। তাই টিলা বা মন্দিরটা চোখে পড়েনি। এখন দেখতে পেয়ে বললুম, 'বরং চলুন, মন্দির দর্শন করে আসি।'

'এক মিনিট! দেখি, ওই প্রজাপতিটা ধরতে পারি নাকি। ওটার নাম জগন্নাথ প্রজাপতি। ডানায় অবিকল পুরী মন্দিরের দেবতা জগন্নাথের ছবি আছে মনে হয়।'

কর্নেল কিটব্যাগ থেকে প্রজাপতিধরা জাল বের করে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলেন। আমি একটা উঁচু পাথরে উঠে লাইটহাউসটা দেখতে থাকলুম। একটু পরে দেখি, লাইটহাউসের নীচের এক বড় পাথরের আড়াল থেকে একজন শিখ ভদ্রলোক বেরুলেন। তারপর তিনি হনহন করে হেঁটে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হলেন। বললুম, 'কর্নেল! প্রণয়লীলা কোথায়? এইমাত্র এক শিখ ভদ্রলোক লাইটহাউসের নীচে থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকলেন।'

জগন্নাথ প্রজাপতি ধরতে ব্যর্থ প্রকৃতিবিজ্ঞানী সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। 'শিখ ভদ্রলোক?' বলে তিনি একটা পাথরে উঠে বাইনোকুলারে তাঁকে খুঁজেত থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'হ্যাঁ। পিচরাস্তার মোড়ে একটা অটোরিকশা দাঁড়িয়ে আছে।

শিখ ভদ্রলোক সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক হয়তো লাইটহাউসে চড়তে গিয়েছিলেন। দরজা আঁটা দেখে ফিরে যাচ্ছেন।'

'অটোরিকশাতে চেপে উনি উল্টোদিকে যাচ্ছেন। হ্যাঁ— মোরামরাস্তায় বাঁক নিয়ে অটোরিকশা চলেছে মন্দিরের টিলার দিকে। পার্বতীর মন্দির ট্যুরিস্টদের দেখার মতো। চারশো বছরের পুরনো মন্দির।' বলে কর্নেল পাথর থেকে নামলেন। বললুম, 'লাইটহাউসের গায়ে কি ওটা, ফলক?'

'হ্যাঁ। পোর্তুগিজ বণিকদের তৈরি লাইটহাউস। ফলকে রোমান অক্ষরে কী সব লেখা আছে, পড়া যায় না। সমুদ্রের নোনা হাওয়ার উপদ্রবে ক্ষয়ে গেছে।'

'চলুন না। দেখে আসি।'

'চলো। দেখি, ওটার কোথাও জগন্নাথ প্রজাপতি থাকতে পারে। তা ছাড়া শিখ ভদ্রলোক ওখানে কী করছিলেন দেখা যাবে।'

ঝোপঝাড় এবং গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা লাইটহাউসের কাছে গেলুম। তারপর কর্নেল বললেন, 'লাইটহাউসের গোড়ায় কত বালি জমেছে দেখছ? লোহার ফ্রেমে আটকানো কপাটের প্রায় অর্ধেকটা বালিতে ভরে গেছে। ঘাস গজিয়েছে প্রচুর। অ্যাঁ? এখানটা যেন কেউ খুঁড়েছিল। ভেজা বালি। ঘাস নেই।'

কর্নেল হাঁটু ভাঁজ করে বসে সেই জায়গাটা খুঁড়তে শুরু করলেন। তারপর টেনে বের করলেন হাত তিনেক লম্বা নাইলনের মোটা দড়ি। বললুম, 'কী অদ্ভুত! শিখ ভদ্রলোকই কি এখানে দড়িটা পুঁতে রেখে গেলেন?'

কর্নেল দড়িটা ঝেড়ে বালি পরিষ্কার করে গম্ভীর মুখে বললেন, 'জয়ন্ত! অবিকল এরকম দড়ির ফাঁসে শ্রাবন্তীকে মারা হয়েছে। হ্যাঁ— একই দড়ি!'

'কিন্তু সেই দড়ি তো পুলিশের কাছে আছে।'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে?'

কর্নেল দড়িটা কিটব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে বললেন, 'খুনী শ্রাবন্তীকে মেরে ফেলার জন্য যে দড়ি কিনে এনেছিল, এটা তারই অংশ। দড়িটা শ্রাবন্তীকে শাওয়ারে ঝোলানোর পক্ষে বেশি লম্বা ছিল। তাছাড়া পুরো দড়িটা প্যান্টের পকেটে ঢোকানো যাচ্ছিল না বলেই এই অংশ কেটে রেখেছিল খুনী। পুলিশ পূর্বাচল হোটেল সার্চ করেনি। কিন্তু পরে যদি প্রত্যেক বোর্ডারের ঘর সার্চ করে, সেই ভয়ে বাকি দড়িটা লুকিয়ে রেখে গেল খুনী। বাইরে কোথাও ছুড়ে ফেললে কারো চোখে পড়তে পারে। তার চেয়ে এই জায়গাটা নিরাপদ। কারণ লাইটহাউসে নাকি সামুদ্রিক অজগর সাপের আড্ডা। সেই ভয়ে পারতপক্ষে কেউ এদিকে পা বাড়ায় না।'

বললুম, 'তা হলে ওই শিখ ভদ্রলোকই তো খুনী!'

'কিন্তু পূর্বাচলে কোনো শিখ ভদ্রলোক ওঠেনি।' বলে কর্নেল হন্তদন্ত হাঁটতে থাকলেন। পিচরাস্তায় পৌঁছে তিনি বাইনোকুলারে মন্দিরের টিলাটা দেখে নিলেন। বললেন, 'নীচের চত্বরে কয়েকটা অটোরিকশা আর দুটো প্রাইভেটকার দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়িতে পুণ্যার্থীরা কেউ নামছেন কেউ উঠছেন। কিন্তু শিখ ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছি না।'

'মন্দিরের দূরত্ব কত এখান থেকে?'

'তা প্রায় দু'কিলোমিটার।'

'হাপস্। এই খর রোদে অতদূর হাঁটতে পারব না। বালিয়াড়ি আর খোলা পাথুরে মাঠ। সারা পথে কোনো গাছ নেই যে, ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেব।'

কর্নেল শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'হুঁ। আজ মেঘ নেই। বড্ড চড়া রোদ। আমার টাক ঘামতে শুরু করেছে। চলো। নিউচন্দনপুরের কাছে বাঁকের মুখে শিরিসগাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়াই। বাইনোকুলারে লক্ষ্য রাখব। শিখ ভদ্রলোককে নিয়ে অটোরিকশাটা এলেই রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে তাকে থামাব। দরকার হলে ফায়ার আর্মস বের করেও থামাব। কুইক জয়ন্ত। চলে এস।'

একটু পরে শিরিসগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কর্নেল বাইনোকুলারে টিলার মন্দির দেখতে থাকলেন। আমি দরদর করে ঘামছিলুম। গাছের ছায়ায় জোরালো হাওয়া ছিল। কর্নেল টুপি খুলে বগলদাবা করেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সামুদ্রিক হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে একটা অটোরিকশা ফিরে এল। তাতে শিখ ভদ্রলোক নেই। এক দম্পতি ছিলেন। বললুম, 'কর্নেল। শিখ ভদ্রলোক যদি প্রাইভেট কারে চেপে আসেন, আগে দেখতে পাবেন কী করে?'

কর্নেল বললেন, 'বাইনোকুলারে টিলার নীচের চত্বর সবটাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এখনও কোনো শিখ ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছি না।'

আরো আধঘণ্টায় তিনটে অটোরিকশা ফিরে এল। কোনোটাতেই শিখ ভদ্রলোক ছিলেন না। আমার উত্তেজনা ততক্ষণে থিতিয়ে গেছে। বললুম, বরং আমি পূর্বাচল হোটেলে গিয়ে ও সি বা ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টরকে টেলিফোনে আপনার কথা জানিয়ে দিই। ওঁরা প্লেন ড্রেসের পুলিশ নিয়ে পার্বতীর মন্দিরে হানা দেবেন।'

এই সময় একটা খালি অটোরিকশা নিউচন্দনপুরের বসতি এলাকা থেকে বেরিয়ে আসছিল। কর্নেল হাত তুলে রিকশাটা ডাকলেন। অটোরিকশার ড্রাইভার হিন্দিতে বলল, 'মন্দির দর্শনে যাবেন স্যার? তাহলে কুড়ি টাকা লাগবে।'

কর্নেল বললেন, 'আমরা যাব। ধরো, আধঘণ্টা পরে ফিরে আসব। পূর্বাচল হোটেলে নামিয়ে দেবে। কত নেবে?'

'সেভেনটি ফাইভ।'

বুঝলাম, সে মওকা বুঝে দর হাঁকছে। দরাদরি করে ষাট টাকার নীচে তাকে নামানো গেল না। কর্নেল অটোরিকশাতে চেপে বসলেন। আমাকেও বসতে হল। এতগুলো টাকা খরচ করে গোয়েন্দাগিরির মানে হয় না। কিন্তু কর্নেলের মাথায় ঝোঁক চেপেছে। তিনি যেন আমার মনের কথা আঁচ করে হাসতে হাসতে বললেন, জয়ন্ত! চারশোবছরের পুরনো মন্দির। আর পার্বতীর বিগ্রহ নাকি আরও প্রাচীন। তোমাকে আমার ক্যামেরায় মন্দির আর বিগ্রহের ছবি তুলে দেব। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় একটা ফিচার লিখে অন্তত আড়াই-তিনশো টাকা পাবে। তা থেকে আমাকে ষাট টাকা উসুল করে দেবে।'

ওঁর কথায় আমারও হাসি এল। বললুম, 'ছবির দরুন আমাদের কাগজ আরও দুশো টাকা দেবে।'

'ব্যস! তাহলে আর কথা কী? তুমি ভাবো, আমি বুঝি ঘরের খেয়ে বনের মোষ হাঁকিয়ে বেড়াই? মোটেও না। অর্কিড, প্রজাপতি, ক্যাকটাস বা নিদেনপক্ষে পাখির ছবি সমেত একটা ইংরেজি ফিচার লিখলেই সব খরচ উসুল হয়ে যায়। তুমি তো জানো, মার্কিন মুলুকের নেচার পত্রিকায় ছবিসমেত তিন পাতা ছাপানো লেখার জন্য আমি পাই কমপক্ষে একশো ডলার।'

'জানি, জানি! আপনি রথ দেখেন এবং কলাও বেচেন।'

কর্নেল আবার গম্ভীর হয়ে বাইনোকুলারে লক্ষ্য রাখলেন। সংকীর্ণ ঘোরামরাস্তা। একটা প্রাইভেট কারকে আমাদের অটোরিকশা সাইড দিল। দেখলুম, গাড়ি ভর্তি মহিলা-কাচ্চা-বাচ্চা এবং দু'জন মাথা ন্যাড়া প্রৌঢ় ভদ্রলোক। পার্বতীর মন্দিরে বোধ হয় মানত সেরে মাথা ন্যাড়া করে এলেন।

পনের মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলুম। টিলাটার নীচের চত্বরে কয়েকটা অটো আর দুটো প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে। কিছু ফুল বিক্রেতা চিৎকার করে ওড়িয়া ভাষায় কিছু বলছে। দুটো ট্রলিতে খাবার বেচছে মিঠাইওয়ালা। ভিড়ে চোখ বুলিয়ে কর্নেল বললেন, 'চলো! সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে ওঠা যাক। জুতো খুলে রাখতে হবে নীচে। জুতো পাহারার লোক আছে। কিছু পয়সা তার প্রাপ্য।'

জুতো জিম্মা রেখে সিঁড়িতে উঠলুম। আগে কর্নেল পেছনে আমি। সিঁড়িটা বেজায় খাড়া। নামতে লোকেদের কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু উঠতে অনেকেই হাঁপিয়ে পড়ছে। বিশ্রাম নিতে নিতে উঠছে। মাঝামাঝি গিয়ে কর্নেল বললেন, 'একটু রেস্ট নেওয়া যাক। চড়া রোদ বলে এই অবস্থা। তা ছাড়া বয়স—'

তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। দেখলুম, ডঃ পরিমল হাজরা তাঁর স্ত্রী মালবিকার একটা বাহু ধরে সাবধানে তাঁকে নামিয়ে আনছেন। কর্নেলকে দেখে ডঃ হাজরা একটু আড়ষ্ট হেসে বলে উঠলেন, 'আর বলবেন না! আমার ধর্ম টর্মে মতি নেই। কিন্তু

আমার মিসেস পার্বতী দর্শন না করে জলগ্রহণ করবেন না।'

মালবিকা হাজরা কর্নেলের দিকে কেন যেন রুষ্ট দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 'যান কর্নেল সায়েব! গেলে পুণ্যি হবে। মানত করে থাকলে চুল গোঁফ-দাড়ি সব কামাতে হবে কিন্তু!'

কর্নেল হাসলেন। তারপর টুপি খুলে বললেন, 'মানত করলে এই টাকের আনাচে-কানাচে যেটুকু চুল আছে, তাতে দেবী তুষ্ট হবেন না। আর গোঁফ দাড়ির যা অবস্থা, তা দেখতেই পাচ্ছেন। সব সাদা হয়ে গেছে। বুড়োর গোঁফ দাড়ি কি দেবীর পছন্দ হবে?'

মিসেস হাজরা আর কথা বললেন না। স্বামীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নামতে শুরু করলেন। ডঃ হাজরা বললেন, ডঃ পাণ্ডে আমার মিসেসকে পার্বতীর মন্দিরেব খবর দিয়ে আমাকে বিপদে ফেলেছেন।'

'ডঃ পাণ্ডের সঙ্গে দেখা হয়নি? ট্রেনের টিকিট পেয়েছেন উনি?'

'এখানে এসে দেখা হল। রাত নটা পঁয়ত্রিশের টিকিট পেয়েছেন। ডঃ পাণ্ডের সঙ্গেই তো মিসেস অসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ পাণ্ডে কখন বেরিয়ে এসেছেন। অগত্যা মিসেস জেদ ধরলেন আমাকে পার্বতীর মন্দিরে নিয়ে আসতে হবে।'

'ডঃ পাণ্ডে এসেছেন এখানে?'

'হ্যাঁ। দেখলুম এখনও লাইনে আছেন। আমি তো পুজো দিতে যাইনি। মান-উওম্যান সেপারেট লাইন।' বলে ডঃ হাজরা গম্ভীর মুখে নেমে গেলেন।

চূড়ার মন্দির প্রাঙ্গণে দুটো লাইন। পুরুষ ও মহিলা আলাদা লাইনে পুজোর উপচার শালপাতায় দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর কর্নেল যাঁকে 'হ্যালো ডঃ পাণ্ডে' বলে সম্ভাষণ করলেন, তাঁকে দেখে আমি অবাক।

পরনে মটকার ধুতি, গলায় জড়ানো মটকার চাদর, খালি গায়ে পৈতে শোভা পাচ্ছে। পাদুটোও খালি। কপালে একপোঁচ সিঁদুর। ডঃ পাণ্ডে বিষণ্ণভাবে বললেন, 'বারোটা পাঁচের ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাস নেই। প্যাসেঞ্জার ট্রেন। একটু পরে একটা মেলট্রেন আছে। তাতে ফার্স্ট ক্লাস আছে। কিন্তু সব বার্থ রিজার্ভড্। বসে পাটনা যাওয়া যায়। কিন্তু ওই ট্রেনে ফার্স্টক্লাসে নাকি সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রীরাও ঢুকে পড়ে। তাই রিস্ক নিলুম না, রাতের ট্রেনই ভালো।'

কর্নেল বললেন, 'পুজো দিলেন তা হলে?'

'দেব না? ব্রাহ্মণ সন্তান। তাছাড়া যা ফাঁড়া গেল!' বলে তিনি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

কর্নেল প্রাঙ্গণের দক্ষিণে পাঁচিলের কাছে গিয়ে নীচে উঁকি দিলেন। দেখলুম, নীচের দিকটা আরো খাড়া এবং ঝোপ জঙ্গল পাথরে ভর্তি।

বাইনোকুলারে তিন দিকটা দেখে নিয়ে কর্নেল ক্যামেরায়। মন্দিরের ছবি তুলালেন। কয়েকটা ছবি বিভিন্ন দৃষ্টোকোণে তুলে তিনি বললেন, 'চলো! নেমে যাই।'

লক্ষ্য করলুম, এখানে পাণ্ডাদের উপদ্রব নেই। ছোট মন্দির। ভক্তের সংখ্যা যথেষ্ট নয় বলেই হয়তো পাণ্ডা নেই। নীচে গিয়ে দেখলুম, হাজরা দম্পতি ডঃ পাণ্ডের প্রতীক্ষা করছিলেন। দুটো অটোরিকশা ওঁদের ভাড়া করা ছিল। ডঃ পাণ্ডের অটোরিকশাকে অনুসরণ করল হাজরা দম্পতির অটোরিকশা।

কর্নেল বললেন, 'কোথায় শিখ ভদ্রলোক? এ তো আশ্চর্য ব্যাপার!'

বললুম, 'দক্ষিণের মাঠ দিয়ে হয়তো কেটে পড়েছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, দৈবাৎ সে আপনাকে দেখে ফেলেছিল।'

'তার অটোরিকশার নাম্বার কাদায় অস্পষ্ট ছিল। পড়তে পারিনি। এটাই সমস্যা!' বলে কর্নেল আমাদের অটোরিকশাতে চেপে বসলেন।

আমিও বসলুম। অটোরিকশা স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করলে বললুম, 'পেছনে তিনদিক খুঁজে দেখা উচিত ছিল।'

কর্নেল আস্তে বললেন. 'আমার বাইনোকুলার কিছু মিস করে না।'

পূর্বাচল হোটেলে ফিরে দেখি, লাউঞ্জে বসে আছেন কৌশল্যাদি। আমাদের দেখতে পেয়ে উঠে এলেন তিনি। বললেন, 'ওপরে চলুন। কথা আছে।'

দোতলায় আমাদের স্যুইটে ঢুকে কৌশল্যাদি বসলেন। আমি ব্যালকনির দরজা খুলে দিলুম। ঝাঁপিয়ে এল সামুদ্রিক হাওয়া। কর্নেল কিটব্যাগ, বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা রেখে আরাম করে বসে বললেন, 'আমার মাথায় হাওয়া দরকার। ফ্যানের সুইচ টেপো জয়ন্ত!'

কৌশল্যাদি বললেন, 'আমি ডঃ আচারিয়াকে রেলস্টেশনে বিদায় দিতে গিয়েছিলুম। এইমাত্র ফিরেছি। ম্যানেজার মিঃ মহাপাত্র বললেন, কিছুক্ষণ আগে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ পটনায়ক এসে তিনতলার ওই ডাবলবেড ১৭নং স্যুইটের সিল ভেঙে তদন্ত করে গেছেন। কনস্টেবলরা চলে গেছে। বিকেলে তিনি আবার এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

কর্নেল বললেন, 'তাতে কী? তুমি যা বলেছ, তা-ই বলবে। শুধু ফাইল চুরির কথাটা চেপে যাবে।'

'আমার মনে হয়, কথাটা বলা উচিত। কারণ পুলিশ মার্ডারের কোনো মোটিভ খুঁজে না পেয়ে অকারণ আমাকে হয়রান করে ছাড়বে। সকালে আমাকে ওঁরা কিছু প্রশ্ন করছিলেন, যা আমার পক্ষে অপমানজনক। তা ছাড়া পুলিশের যা সর্বত্র রীতি, যার-তার কাঁধে দায় চাপিয়ে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে দায়িত্ব পালন করা।'

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। '...হ্যাঁ,

দিন। ...বলুন মহীতোষবাবু? ...আপনার ভাগনেকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে? কেন? ... কী আশ্চর্য! কী নাম ওর? ... অমল রায়? .. আচ্ছা আচ্ছা! আমি দেখব, কী করা যায়। ... আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। ... আমি দেখছি কী করা যায়। ছাড়ছি।'

কর্নেল টেলিফোন রেখে বললেন, 'কৌশল্যা! সেই যুবকটিকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। তবে এটা মন্দের ভালো। জেরার চোটে যদি অমল এমন কিছু বলে, যা আমার থিয়োরিকে শক্ত করবে।'

কৌশল্যাদি অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললুম, 'আপনার থিয়োরিটা কী?

কর্নেল হাসলেন। 'পাগলাবাবুর গানের মতো। পাখি সব করে রব... ইত্যাদি।'

কৌশল্যাদি তাঁর বাক্যের বাংলা অংশটুকু বুঝতে না পেরে বললেন, 'পাখি? সেটা কী?'

কর্নেল পাগলাবাবু সম্পর্কে এবং তাঁর বিদঘুটে সুরে গাওয়া বাংলা পদ্যটার ইংরেজি অনুবাদসহ তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'তুমি পাগলাবাবুকে দেখে থাকবে?'

হ্যাঁ। দেখেছি, গত পরশু বিকেলে কনফারেন্স শেষ হওয়ার পর বেরিয়ে আসছিলুম। নীচের রাস্তায় পাগলাবাবু আমার সামনে দাঁড়িয়ে স্মার্ট ইংলিশে বলছিলেন, এক কাপ কফি খাওয়ালে তিনি আমাকে একটা গোপন তথ্য (সিক্রেট ইনফরমেশন) দেবেন। একটু অবাক হয়েছিলুম। যাই হোক, পাগলের হাত থেকে বাঁচতে একটা পাঁচ টাকার নোট দিলুম। তারপর পাগলাবাবু চাপা গলায় বললেন, ম্যাডাম। ভুতের হাত লম্বা হয়। জিজ্ঞেস করলুম, তার মানে? পাগলাবাবু জবাব দিলেন না। একটা রোডসাইড কাফের দিকে ছুটে গেলেন।'

কর্নেল আওড়ালেন, 'ঘোস্টস্ হ্যাভ লং হ্যান্ডস্!'

'হ্যাঁ। ঠিক এই কথাটাই বললেন।'

'তারপর আর দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে?'

'না। আমি তাঁকে দেখলেই এড়িয়ে গেছি।'

কর্নেল সোজা হয়ে বসে বললেন, 'কৌশল্যা! পাগলাবাবু যে-ই হোন, তিনি সম্ভবত তোমাকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন। এবার দেখা হলে তুমি তাঁকে বলবে, ভূতের লম্বা হাত তোমার ঘরে ঢুকেছিল। লক্ষ্য করবে, এ কথা শুনে পাগলাবাবুর কী প্রতিক্রিয়া হয়। আসলে পাগলারা কোনো-কোনো সময় সুস্থ মানুষের মতো আচরণ করে। তাই দেখবে, কোনো পাগল রাস্তায় কখনও গাড়ি চাপা পড়ে না। পাগলরা কখনও আত্মহত্যাও করে না।'

কৌশল্যাদি চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন। আমি বললুম, 'আপনিই বলছিলেন সেয়ানা পাগল।'

।। পাঁচ ।।

স্নানাহারের পর অভ্যাসমতো ভাতঘুম দিতে শুয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ সেই ঘুম ভেঙে গেল। দেখলুম, কখন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর কল্যাণ পটনায়ক এসেছেন। কর্নেলের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। দুজনের কথাবার্তা শোনার জন্য চোখ বুজে পড়ে রইলুম।

হ্যাঁ। অমল রায় তা-ই বলছে। মিঃ পটনায়ক বলছিলেন। 'মহীতোষ বিশ্বাস প্রভাবশালী লোক। তার ভাগনে হচ্ছে এই অমল। তাই আমাদের একটু সংযত থাকতে হয়েছে।'

কর্নেল বললেন, 'অমলের সহপাঠিনী ছিল শ্রাবন্তী। এটার প্রমাণও তো আপনারা পেয়েছেন।'

'তা অবশ্য পেয়েছি। মহীতোষবাবু আমাদের টেলিফোন পেয়ে অমলের কলেজের ডিগ্রি ইত্যাদির প্রমাণপত্র দিয়ে গেছেন।'

'ডঃ হাজরাও তো বলেছেন, শ্রাবন্তী প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিল?'

'হ্যাঁ। টেলিফোনে বলেছেন। শ্রাবন্তীর জিনিসপত্রের মধ্যে অবশ্য ওর পড়াশুনোর ডিগ্রি সংক্রান্ত কোনো ডকুমেন্ট পাইনি।'

'যাই হোক, ভুবনেশ্বরের অমল কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল। এর প্রমাণ পেয়ে গেছেন। কাজেই সহপাঠিনীর সঙ্গে অমলের এমোশনাল সম্পর্ক থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

মিঃ পটনায়ক বললেন, 'কিন্তু অমল এই হোটেলে এসে থাকতে চেয়েছিল কেন, এই প্রশ্নের জবাব পাইনি। তার মামার বাড়ি তো নিউচন্দনপুরেই।'

কর্নেল হাসলেন। 'যুবক-যুবতীদের মধ্যে এমোশনাল সম্পর্ক গড়ে উঠলে তারা কাছাকাছি থাকতে চাইবে।'

'আমার দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা কর্নেল সরকার। অমলের চরিত্র সম্পর্কে যতটুকু খোঁজ পেয়েছি, সে অসচ্চরিত্র লম্পট প্রকৃতির যুবক। সিনেমায় একবার চান্স পাওয়ার পর সে নিজেই সিনেমার পরিচালক হতে চেয়েছে। কিন্তু ওটা তার একটা অছিলা। আসলে নিজের লাম্পট্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই তার উদ্দেশ্য।'

'এর সঙ্গে সহপাঠিনী বা ধরা যাক— প্রেমিকা শ্রাবন্তীকে সে... ' মিঃ পটনায়ক হঠাৎ থেমে সিগারেট ধরালেন। চোখের ফাঁক দিয়ে দেখলুম, তিনি সিগারেটের ধোঁয়ার রিং তৈরির ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

কর্নেল বললেন, 'মিঃ পটনায়ক! তাহলে বলতে হয়, অমল যেন আগেই জানত যে শ্রাবন্তী তার কুপ্রস্তাবে রাজি হবে না, তাই সে সঙ্গে নাইলনের দড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল।'

মিঃ পটনায়ক একটু পরে বললেন, 'হ্যাঁ। আমি তা ভেবে দেখেছি! তবে--'

তাঁর কথার ওপর কর্নেল বললেন, 'হোটেলের রিসেপশন স্টাফের সাক্ষ্য দেখা যাচ্ছে, শ্রাবস্তী নিজেই আমলের জন্য একটা স্যুইট চেয়েছিল।'

'কোনো পুরনো প্রতিহিংসার ব্যাপার থাকতে পারে না কি কর্নেল সরকার? শ্রাবস্তী হয়তো মনে রাখেনি। কিন্তু অমল ভোলেনি।'

কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'জয়ন্ত! চোখ বুজে শুয়ে না থেকে উঠে পড়ো! আমরা মিঃ পটনায়ককে এবার ম্যাজিক দেখাব।'

মিঃ পটনায়ক হাসলেন। 'কাগজের লোক, তাই নিজেই আড়িপাতা যন্ত্র সেজেছেন জয়ন্তবাবু! কিন্তু ম্যাজিকটা কী?'

অগত্যা উঠে পড়লুম। কর্নেল তাঁর কিটব্যাগ থেকে সেই হাত তিনেক নাইলনের দড়িটা বের করে বললেন, 'এই দেখুন ম্যাজিক!'

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ঝটপট দড়িটা হাতে নিয়ে বললেন, 'একই দড়ি মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। খুনী লম্বা দড়ি কিনেছিল। কিন্তু এই অংশটা কেটে বাদ দিয়েছিল। তাড়াহুড়ো করে কাটা। তাই এই প্রান্তটার বুননি খুলে ছেতরে গেছে। শেষ প্রান্তে গিঁট।'

'কী আশ্চর্য! শ্রাবস্তীর গলায় বাঁধা দড়িটার একপ্রান্তে গিঁট। অন্য প্রান্ত ঠিক এইরকম কাটা। কোথায় পেলেন এটা?'

কর্নেল সংক্ষেপে দড়ি উদ্ধার এবং পার্বতীর মন্দিরে ছুটে গিয়ে সেই শিখ ভদ্রলোককে খুঁজে বের করার ব্যর্থ চেষ্টার বিবরণ দিলেন। শেষে বললেন, 'জয়ন্তই প্রথমে লোকটাকে দেখতে পেয়েছিল!'

মিঃ পটনায়ক কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থাকার পর বললেন, 'তা হলে অমলের একটা কথাকে এখন গুরুত্ব দেওয়া চলে।'

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কথা?

'শ্রাবস্তী কাল সন্ধ্যার একটু আগে তাকে নাকি বলেছিল কথাটা। ডঃ কৌশল্যা বর্মনের সঙ্গে একই স্যুইটে তার থাকতে ভয় হচ্ছে। কারণ সে নাকি এইমাত্র একটা উড়ো চিঠি পেয়েছে। সেই চিঠিতে কেউ তাকে লিখেছে, মহিলাবিজ্ঞানীকে খুন করা হবে। তাঁর সঙ্গে থাকলে তুমিও খুন হয়ে যাবে।'

কর্নেল নিষ্পলক দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু শ্রাবস্তী কেন সে কথা কৌশল্যাকে বলেনি?'

'অমলও তাঁকে বলতে বলেছিল। ডঃ বর্মনকে জেরা করে তেমন কোনো কথা শ্রাবস্তী বলেছিল কি না জানবার জন্যই এ বেলা আমি এসেছি। এটা জরুরি ব্যাপার। তাই ডঃ বর্মনকে বলে রেখেছি, তাঁর সঙ্গে আরো কথা বলতে চাই।'

'কৌশল্যা এমন কথা শুনে থাকলে সতর্ক হত এবং আমাকে অবশ্যই বলত। আমার মনে হচ্ছে, শ্রাবন্তী যে-কোনো কারণেই হোক, তাকে কথাটা বলেনি। সেই উড়ো চিঠিটা কি অমলকে দেখিয়েছিল শ্রাবন্তী?'

'না। অমল বলেছে, চিঠিটা শ্রাবন্তী ভয় পেয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল।'

কর্নেল একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'এটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে।'

মিঃ পটনায়ক বললেন, 'হ্যাঁ। তবে অমল নাকি ওই কথা শুনেই তাকে রাত্রে গার্ড দেবার জন্য এই হোটেলে থাকতে চেয়েছিল। তাই শ্রাবন্তী তার হয়ে দোতলার খালি সিঙ্গল স্যুইটটা রিসেপশনে এসে বুক করতে চেয়েছিল। কিন্তু রিসেপশনের দাসবাবু এবং কমলাদেবী অমলকে চেনেন। তাই --'

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'জানি।' তারপর নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি ফের বললেন, 'ডঃ হাজরা শ্রাবন্তীর এমপ্লয়ার। শ্রাবন্তী তাঁরই ল্যাব-অ্যাসিস্টান্ট। ওই সাংঘাতিক কথাটা শ্রাবন্তীর ডঃ হাজরাকে তো বলা উচিত ছিল?'

'ডঃ হাজরা চেপে গেছেন সম্ভবত। তাঁকেও আবার জেরা করতে হবে।'

'তার আগে চলুন, আমরা কৌশল্যার ঘরে যাই।' কর্নেল উঠলেন। 'জয়ন্ত! তুমি আর শুয়ে পড়ো না। তিনটে বাজে। তুমি ব্যালকনিতে বসে সমুদ্র দর্শন কর! আমি আসছি।'

আমারও ওঁদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু না ডাকলে যাই কী করে? অগত্যা ব্যালকনিতে বসে সিগারেট টানতে থাকলুম।

কিছুক্ষণ পরে কেউ দরজায় নক করল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি ডঃ পরিমল হাজরা। তাঁকে একটু উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলেন, 'কর্নেল সায়েব কোথায়?'

বললুম, 'উনি ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে বেরোলেন।'

'ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কোথায় গেলেন জানেন?'

ইচ্ছে করেই বললুম, 'বলে যাননি। আপনি ভেতরে আসুন না!'

ডঃ হাজরা অনিচ্ছার সঙ্গে ভেতরে এলেন। দরজাটা নিজেই বন্ধ করে দিলেন। তারপর চেয়ারে বসে বললেন, 'কর্নেল সায়েবের সঙ্গে একটা বিষয়ে পরামর্শ করতুম।'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'শ্রাবন্তী আপনাকে একটা-উড়োচিঠির কথা বলেছিল, সেই বিষয়ে?'

ডঃ হাজরা চমকে উঠলেন। 'উড়োচিঠি? কিসের উড়োচিঠি?'

'আপনাকে শ্রাবন্তী কিছু বলেনি তা হলে?'

'না তো!'

আমার মধ্যে যেন কর্নেল ভর করেছেন তখন। বললুম, 'শ্রাবন্তী আপনাকে কি বলেনি ডঃ কৌশল্যা বর্মনের সঙ্গে একই ঘরে থাকতে তার ভয় করছে?'

ডঃ হাজরা মাথা নেড়ে বললেন, 'ভয় করার কথা বলেনি। তবে বলেছিল, ভদ্রমহিলা তাকে পাত্তা দেন না। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন। তাই ওঁর সঙ্গে তার থাকতে ভালো লাগছে না। আমি বলেছিলুম, আর তো দুটো দিন কিংবা বড় জোর তিনটে দিন থাকছি। তার আগেই ডঃ বর্মন চলে যাবেন। একটু সহ্য করে থাকো। কিন্তু আপনি উড়ো চিঠি ফিটির কথা বলছেন। কে বলেছে আপনাকে?'

মাথায় বুদ্ধি ফিরে এল এবার। বললুম, 'গুজব শুনেছি।'

ডঃ হাজরা বললেন, 'কত গুজব শোনা যাবে এখন। সব বাজে কথা। আমি কর্নেল সায়েবের সঙ্গে একটা বিষয়ে পরামর্শ করতে চাই।'

একটু হেসে বললুম, 'আমাকে বলতে আপত্তি কিসের? কর্নেল আমাকে কোনো কথা গোপন করেন না। আমি বরং কর্নেলকে বলে রাখব আগে থেকে। তাতে উনি ভাবনা-চিন্তার সময় পাবেন। তারপর আপনি কথা বলবেন।'

'আমার ল্যাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রাবন্তীর ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ সবই পুলিশ কাস্টডিতে আছে। শ্রাবন্তীর কাছে আমার কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চ পেপার রাখতে দিয়েছিলুম। সেগুলো আমার দরকার। কারণ ডঃ পাণ্ডে তো রাতের ট্রেনে পাটনা ফিরে যাবেন। তার আগে কর্নেল সায়েব যদি পুলিশকে বলে সেগুলো আমাকে ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, ভালো হয়।'

'শ্রাবন্তীর জিনিসপত্র পুলিশ আপনাকে দিতে চাইছে না নাকি?'

'সকালে ও সি এবং ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টরকে কথাটা বলেছিলুম। কিন্তু ওঁরা বললেন, সব সার্চ করে দেখা হবে। তারপর শ্রাবন্তীর বাবা বা গার্জেন এলে তার জিনিসপত্র তাঁরহাতে তুলে দেওয়া হবে। আপনি তাঁর কাছে আপনার কী আছে-না-আছে, চেয়ে নেবেন। এটা পুলিশের বজ্জাতি নয়? বলুন।'

'শ্রাবন্তীর বাবা আছেন?'

'হ্যাঁ। খবর পাওয়ার পর তাঁর আসতে দেরি হতে পারে। তারপর তো তাঁর মানসিক অবস্থা কী হবে বুঝতেই পারছেন। পুলিশ কাস্টডি থেকে জিনিসপত্র ডেলিভারি পাওয়া— ওদিকে শ্রাবন্তীর শেষকৃত্য কোথায় তাঁর বাবা করবেন, এ সব নিয়ে তিনি ব্যস্ত থাকবেন। ওই অবস্থায় আমার রিসার্চ পেপার চাওয়া কি উচিত? বরং তিনি আসবার আগেই আমি আমার পেপারগুলো পেলে ভালো হয়।'

'শ্রাবন্তীর বাবা কী করেন?'

'শুনেছি রিটায়ার্ড সরকারি কর্মচারী। বয়স প্রায় ৬৫-৬৬ বছর। একবার নাকি স্ট্রোক হয়ে গেছে। এমন মানুষ এসে পৌঁছুতে দেরি হতেই পারে। তা ছাড়া ট্রেনের যা

অবস্থা!'

একটু অবাক হয়ে বললুম, 'খবর তো কাল রাতেই পুলিশ কলকাতার লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়েছি শুনেছি। এখনও এসে তিনি পৌঁছুতে পারলেন না?'

'তা হলেই বুঝুন!'

'শ্রাবন্তীর বাবার নাম কী?'

'মৃগাঙ্ক সেন। আমি তাঁকে অবশ্য দেখিনি।' বলে ডঃ হাজরা ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন। 'দেখি, কর্নেল সায়েব নীচে লাউঞ্জে আছেন নাকি।'

ডঃ হাজরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আণবিক জীববিজ্ঞানী পরিমল হাজরার মাথায় হঠাৎ তাঁর রিসার্চ পেপারের চিন্তা এল কেন? গত চারদিনে ডঃ পাণ্ডের সঙ্গে তাঁর অসংখ্যবার দেখা হয়েছে। আজ ডঃ পাণ্ডে চলে যাবার দিন বিকেলে ডঃ হাজরা তাঁর সঙ্গে নিজের রিসার্চ বিষয়ে আলোচনা করতে চান।

ওটা কৌশল্যাদিব চুরি যাওয়া সেই রিসার্চ পেপারটা নয় তো? এমন তো হতেই পারে, শ্রাবন্তীকে যে খুন করেছে, সে কৌশল্যাদির ফাইলটা চুরি করেনি অর্থাৎ শ্রাবন্তী খুন হয়েছে অন্য কোনো কারণে? আর কৌশল্যাদির রিসার্চ পেপারের ফাইল শ্রাবন্তীই ডঃ হাজরার নির্দেশে চুরি করেছিল?

কর্নেলকে এখনই বলা উচিত আমার এই থিয়োরিটা। কিন্তু এখনও হয়তো কর্নেল এবং মিঃ পটনায়ক কৌশল্যাদির স্যুইটে বসে কথা বলছেন। আমার এ সময় সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না।

ব্যালকনিতে গিয়ে বসলুম। তারপর চোখে পড়ল মজার দৃশ্য। দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের কাছে ডঃ পাণ্ডে হাত তুলে মারতে যাচ্ছেন পাগলাবাবুকে। পাগলাবাবু অমনি সরে গিয়ে তর্জনী তুলে তাঁকে কিছু বলছেন। বারকতক হাত তোলার পর ডঃ পাণ্ডে যেন খেপে গেলেন। একটা পাথর তুলে তাড়া করলেন পাগলাবাবুকে। অমনি পাগলাবাবু সবেগে নীচের কেয়াবনের ভেতর উধাও হয়ে গেলেন।

ডঃ পাণ্ডে রাশভারি মানুষ। পাগলের পাগলামি তিনি বরদাস্ত না করতেই পারেন। তবে তাঁর মতো সিরিয়াস লোককে পাগলের পাগলামিতে এত বেশি খেপে যেতে দেখে কৌতুক অনুভব করলুম। তারপর একটু অস্বস্তিও হল। পাথরটা গায়ে লাগলে পাগলাবাবু নির্ঘাত মারা পড়তেন।

ডঃ পাণ্ডে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে বিচে নেমে গেলেন।

দরজায় কেউ নক করল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি নব চা এনেছে। চারটে বেজে গেল এর মধ্যে? বললুম, 'কর্নেল সায়েবকে দেখেছ?'

নব বলল, 'আজ্ঞে, উনি আর সাদা পোশাকের পুলিশ অফিসার একটু আগে

ক্যান্টিনহলে গিয়ে কফি খাচ্ছেন।'

'কৌশল্যাদি-- মানে ডঃ কৌশল্যাই বর্মন ওঁদের সঙ্গে নীচে যাননি?'

'না। বর্মন দিদিমণিকে চা দিয়ে এলুম ওঁর ঘরে।'

'একা আছেন উনি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হাজরা সায়েব আর তাঁর মিসেসকে দেখেছ?'

'হাজরা সায়েবকে দেখিনি। ওঁর ওয়াইফ একা হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলেন দেখলুম।'

'আচ্ছা নব! এই এলাকায় কোনো শিখ ভদ্রলোককে তুমি আজ কোনো সময় দেখেছ?'

নব গাল চুলকে বলল, 'এই হোটেলে তো দেখিনি।'

'হোটেলে নয়, রাস্তায়। অটোরিকশা চেপে যাচ্ছিলেন এমন কাউকে?'

'আমি তো বেরোই কম। লক্ষ্য করিনি স্যার!'

'ঠিক আছে।'

নব চলে গেলে দরজা আটকে ব্যালকনিতে গিয়ে বসলুম। চা জুড়িয়ে গেছে প্রায়। এবার টের পেলুম আমাকে গোয়েন্দার ভূতে ধরেছে। নিজের ওপর খাপ্পা হয়ে চা শেষ করে সিগারেট ধরালুম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, আর ওইসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাব না। তবে কর্নেলকে শুধু ডঃ হাজরার ব্যাপারটা জানিয়ে দেব।

বিচের দিকে তাকিয়ে দেখলুম কালকের মতোই ডঃ পাণ্ডের সঙ্গ ধরেছেন মিসেস মালবিকা হাজরা। তারপর বাঁ দিকে ঘুরতেই চোখে পড়ল একই দৃশ্য। গাধাটার পেছনে লেগেছেন পাগলাবাবু।

ঠাণ্ডা চা খেয়ে মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। প্যান্ট-শার্ট পরে ব্যালকনির দরজা এঁটে বেরিয়ে গেলুম। স্যুইটের দরজা আপনা-আপনি লক হয়ে গেল।

নীচে গিয়ে ক্যান্টিনে দেখি, আর কেউ নেই। শুধু কর্নেল আর মিঃ পটনায়ক বসে চাপাস্বরে কথা বলছেন। ডঃ হাজরা লাউঞ্জে চুপচাপ বসে আছেন। কর্নেল হাত তুলে আমাকে ডাকলেন।

কাছে গিয়ে বললুম, 'ঠাণ্ডা চা খেয়ে মেজাজ খারাপ। তাই গরম চা খেতে এলুম।'

কর্নেল হাসলেন। 'নব তো প্রচণ্ড গরম চা দেয়। চা তাহলে তোমার নিজের দোষেই ঠাণ্ডা হয়েছে। কিছু দেখতে অন্যমনস্ক ছিলে কিংবা নবর সঙ্গে কথা বলছিলে!'

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ পটনায়কও মুচকি হেসে বললেন, 'কাগজে লেখার মতো বিষয় চোখে পড়েছিল জয়ন্তবাবুর।'

সঞ্জয় নামে তরুণ হোটেলবয় কর্নেলের ইশারায় তৎক্ষণে হাজির হয়েছিল। তাকে

আমার জন্য কফির অর্ডার দিয়ে কর্নেল বললেন, 'চুপ করে না থেকে বলো জয়ন্ত, কেন চা ঠাণ্ডা হল?'

এবার আমিও হেসে ফেললুম। 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। নবর সঙ্গে কথা বলছিলুম।'

'কিছু মিলল তার কাছে?'

'নাহ্। তবে তার আগে ডঃ হাজরা আপনার খোঁজে গিয়েছিলেন।'

মিঃ পটনায়ক ঘড়ি দেখে বললেন, 'তা হলে উঠি কর্নেল সরকার। শ্রাবন্তীর জিনিসপত্রের মধ্যে ডঃ হাজরার কোনো পেপার থাকলে সেটা আমাদের লোক আগে আপনার মাধ্যমে কৌশল্যাদেবীকে গোপনে দেখাবে। তারপর আপনিই সিদ্ধান্ত নেবেন প্রয়োজনে সঙ্গে সঙ্গে রিং করবেন আমাকে।'

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর চলে যাওয়ার পর বললুম, 'কৌশল্যাদির ফাইল চুরির কথা তা হলে শেষ পর্যন্ত বলেছেন পুলিশকে?'

কর্নেল বললেন, 'আমি বলিনি। কৌশল্যাই হঠাৎ বলে ফেলল। আসলে ওকে দোষ দেওয়া উচিত হবে না। ভীষণ মানসিক চাপের মধ্যে ছিল বেচারি।'

'দড়িটা দিয়েছেন মিঃ পটনায়ককে?'

'হ্যাঁ। শিখ ভদ্রলোকের কথা বলেছি। মিঃ পটনায়ক বুদ্ধিমান। ওঁর মতে, খুনী শিখের ছদ্মবেশ ধরেছিল এবং পার্বতীর মন্দিরে কাকেও দেখা করতে গিয়েছিল। তারপর ওখানেই ঝোপঝাড়ের আড়ালে মাথার পাগড়ি মুখের গোঁফ-দাড়ি, হাতের বালা ইত্যাদি খুলে ব্যাগে ভরে রাখে। তাই আমরা গিয়ে তাকে আর দেখতে পাইনি।'

'কিন্তু আপনার থিয়োরি কী?'

'একই।' কর্নেলের চুরুট জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়েছিল। অ্যাশট্রেতে ঘষে নিভিয়ে বললেন, 'আসলে আমার থিয়োরি মিঃ পটনায়কের মুখ দিয়ে যাচাই করে নিয়েছি। একই অঙ্ক দু'জনে আলাদাভাবে কষে একই ফল বেরিয়েছে।'

'কৌশল্যাদি কি বললেন যে, তাঁকে শ্রাবন্তীর উড়োচিঠির কথা বলেছিল, কিংবা কোনোভাবে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল— অন্তত পরোক্ষভাবে?'

'নাহ্। তবে শুনলে অবাক হবে, শ্রাবন্তীর বিছানার ম্যাট্রেসের তলায় একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আর একটা ছোট্ট সাঁড়াশি উদ্ধার করেছেন ও সি মিঃ রণবীর জেনা।'

'কখন?'

'আজ বেলা সাড়ে এগারোটায় যখন তিনি এসে দ্বিতীয়বার ঘর সার্চ করেন, তখন ওই দুটো জিনিস পাওয়া গেছে। তখন আমরা ছিলুম না হোটেলে।'

'তা হলে শ্রাবন্তীই ফাইল চোর?'

'তা বলা কঠিন। খুনীই ওই জিনিস দুটো তার ম্যাট্রেসের তলায় রেখে তাকেই

ফাইল চোর সাব্যস্ত করতে চেয়েছে-- এমনও তো হতে পারে।'

'কিন্তু শ্রাবন্তীকে খুন না করে ভয় দেখিয়েও তো কেউ ফাইল চুরি করে পালাতে পারত?'

'ওহ্ জয়ন্ত! তুমি ভুলে গেছ আমার থিয়োরি। খুনী শ্রাবন্তীর চেনা। তাই তার মুখ চিরতরে বন্ধ করার জন্যই ফাইলচোর তাকে হত্যার প্ল্যান করেছিল। ইন্টারলকিং সিস্টেমের সমস্যা আছে। ১৭ নম্বর স্যুইটের লক ভাঙার ঝুঁকি প্রচুর। করিডরে যে-কোনো মুহূর্তে কেউ না কেউ এসে পড়বে। কাজেই ফাইলচোর ওত পেতে ছিল কখন শ্রাবন্তী একা স্যুইটে ঢুকবে। তার সঙ্গে কথা বলার ছলে সে ভেতরে যাবে।

'যদি শ্রাবন্তীর না ঢুকে একা কৌশল্যাদি ঢুকতেন?'

'কৌশল্যারও হয়তো একই অবস্থা হত কি না বলা কঠিন। কারণ শ্রাবন্তী যে কোন সময় এসে পড়ত। তবে ফাইলচোর আগে কৌশল্যা কোথায় আছে সে বিষয়ে শিওর হয়েছিল। মনে করে দেখ, তখন কৌশল্যাই ছিল হোটেল দ্য শার্কে ডঃ আচারিয়ার কাছে। অতএব সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল ফাইলচোর।'

'কিন্তু শ্রাবন্তী উড়োচিঠি পেয়েও সতর্ক করেনি কেন কৌশল্যাদিকে-- এটা অদ্ভুত মনে হয় না?'

কর্নেল মাথা নাড়লেন। 'না, ব্যাপারটা টাইমিং ফ্যাক্টরের। অর্থাৎ সময়টা হিসেব করতে হবে। তা হলেই সমস্যার জট খুলে যাবে। অমলের স্টেটমেন্টও জট খোলার ব্যাপারে সাহায্য করেছে।'

এতক্ষণে কফি আনল সঞ্জয়। বলল, 'স্যার! দেরি হয়ে গেল। পারকোলেটারে গণ্ডগোল হয়েছিল।'

'ঠিক আছে।' বলে কর্নেল তাকে চলে যেতে ইশারা করলেন। সে চলে গেলে তিনি বললেন, 'বৃষ্টির আগে শ্রাবন্তীকে ডঃ হাজরা দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে গোপনে প্রেম নিবেদন করতে ডেকে নিয়ে যান। কৌশল্যা তাঁদের দেখেই ফিরে আসে। তার কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি শুরু হয়। ডঃ হাজরা ও শ্রাবন্তী মাথা বাঁচাতে ছুটে আসেন এবং ডঃ হাজরার স্ত্রীর ভয়ে একা হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই না?'

'ঠিক বলেছেন।'

'ঠিক এই সময় শ্রাবন্তী দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে ছুটে এসে রোডসাইড কাফের বিশাল ছাতার তলায় যদি আশ্রয় নেয়? এটাও তো স্বাভাবিক। সেখানে আরো অনেক আশ্রয় নিয়েছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে কেউ তার হাতে একটা চিঠি যদি গুঁজে দেয়? এরপর চিঠিটা পড়ে সে অমলকে খুঁজে বের করতে পারে। তারপর অমল তাকে গার্ড দেবার জন্য এই হোটেলে একটা স্যুইট বুক করার প্রস্তাব দিতে পারে।'

বললুম, 'দিতে পারে কী? দিয়েছিল। কিন্তু দাসবাবু আর কমলাদেবী না করে দেন।'

কর্নেল বললেন, 'এরপর শ্রাবন্তী স্যুইটে ফিরে যায় এবং খুনীও তাকে ফলো করে।'

হাসতে হাসতে বললুম, 'আপনার অঙ্কটা ঠিক আছে। তবে আকস্মিকতা বড্ড বেশি।'

'জয়ন্ত! সব হত্যাকাণ্ডের পেছনে প্ল্যান থাকে। কিন্তু হত্যার ঘটনা আচম্বিতে মওকা পেলেই ঘটে যায়।'

।। ছয় ।।

আমার কফি খাওয়া শেষ হলে কর্নেল বললেন, 'চলো জয়ন্ত! সমুদ্র দর্শন করে আসি। আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। আশা করি বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না।'

আমরা লাউঞ্জে যেতেই ডঃ হাজরা উঠে এসে বললেন, 'কর্নেল সায়েব! আমার পেপারগুলো পুলিশ শিগগির পাঠাবে তো?'

কর্নেল বললেন, 'হ্যাঁ। সন্ধ্যা ছ'টার আগেই পেয়ে যাবেন।'

পরিমল হাজরা বললেন, 'ডঃ পাণ্ডে সি-বিচে বেড়াতে গেছেন। যাই! ওঁর সঙ্গে একটু আগাম আলোচনা সেরে নিই।'

কর্নেল লনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডঃ হাজরা রাস্তা পেরিয়ে নিচু বালিয়াড়ির মধ্যে দিয়ে বিচে নেমে গেলেন। তারপর কর্নেল পা বাড়ালেন। আস্তে বললেন, 'চলো! দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে গিয়ে উঁচু থেকে সমুদ্র দর্শন করব।'

বাঁদিকে রাস্তার পূর্বে ত্রিভুজ ভূমির নীচে ঘাসজমিতে গাধাটা চরছে। কিন্তু পাগলাবাবুকে দেখতে পেলুম না। ঝোপ-জঙ্গল আর পাথরের মধ্যে দিয়ে আমরা কাশবনটা ডানদিকে রেখে ধ্বংসস্তূপের কাছে পৌঁছলুম। কর্নেল বললেন, 'এটা একটা ক্যাসল। আমরা দুর্গপ্রাসাদ বলছি। ওড়িশার কোনো সামন্তরাজা এখানে থাকতেন শুনেছি। তবে স্থাপত্যটা মোগল-ধাঁচের। এখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখলে অবাক হয়ে যাবে।'

এই সময় হঠাৎ একটা স্তূপের আড়াল থেকে একজন শিখ ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। কর্নেলও প্যান্টের পকেট থেকে দ্রুত তাঁর সিক্স রাউন্ডার রিভলভার বের করেছিলেন। পরক্ষণে অস্ত্রটা পকেটস্থ করে তিনি তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হাসলেন।

এবার দেখলুম, শিখের পাগড়ি আর নকল গোঁফদাড়ি খুলে পাগলাবাবু আর্তস্বরে বলে উঠলেন, 'মাইরি মরে যাব! ওরে বাবা! এ কি বিপদ হল?'

কর্নেল হাসি থামিয়ে বললেন, 'এই পাগড়ি আর গোঁফদাড়ি কোথায় পেলেন আপনি?'

পাগলাবাবু ভয়ার্তমুখে বললেন, 'এখানে বালিতে পোঁতা ছিল। ভিজে বালি দেখে ভেবে ছিলুম যখের ধন পুঁতে রেখে গেছে কেউ। মাইরি স্যার! কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল কি না? পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল কি না? বলুন?'

'হ্যাঁ। রহস্যের অন্ধকার রাত আর নেই। সকাল হয়েছে।'

পাগলাবাবু হাসলেন খিট্‌খিট্ করে। 'হয়েছে তো? বলুন স্যার? রাতি পোহাইল তো?'

'অবশ্যই। এবার দিন ওগুলো। হ্যাঁ— কঙ্গন আর কৃপাণটাও দিন।'

'কফি খাওয়াবেন বলুন?'

'নিশ্চয় খাওয়াব।'

'তা হলে চুপিচুপি দিই। চুপিচুপি নিন।'

কর্নেল জিনিসগুলো নিয়ে বললেন, 'রাত্রি অনেক আগেই পুইয়ে সকাল হয়েছিল। আমি বুঝতে পারিনি এই যা!'

পাগলাবাবু হাত পেতে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। কর্নেল তাঁর হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট দিলেন। পাগলাবাবু নোটটা পেয়েই ছিটকে কেয়াঝোপের ধারে গেলেন। তারপর বুড়ো আঙুল নেড়ে বললেন, 'ব্লাফ্ দিয়েছি! মাইরি কেমন ব্লাফ্ দিয়েছি! রাতি এখনও মোটেও পোহায়নি! পাখি সব রব করলে তবে তো?'

কর্নেল বললেন, 'আরো পাঁচ টাকা দেব যদি রাতি পোহায়।

পাগলাবাবু খিট্‌খিট্ করে হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার কাছে রিভলভার আছে। ওরে বাবা! তুমি ডেঞ্জারাস লোক। তোমার কাছে আর যাচ্ছি না!' বলে তিনি আমার দিকে আঙুল তুললেন, 'এই যে ভাই! তুমি ওই নোটটা আমাকে দিয়ে যাও না। তোমাকে ব্লাফ দেব না। মাইরি মাকালীর দিব্যি! কাম অন মাই সান! কাম অন!'

আমি কর্নেলের হাত থেকে আর একটা পাঁচ টাকার নোট নিয়ে তাঁর কাছে গেলুম। পাগলাবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'আবার যকের ধন। লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়।'

বললুম, 'যখের ধনটা কোথায় বলুন আগে।'

পাগলাবাবু খিট্‌খিট্ করে হেসে আবার ফিসফিস করে বললেন, 'গাধার গলায় বেঁধে রেখেছি। মাইরি বলছি! গাধাটাকে আমি তাড়া করে এই জঙ্গলে ঢোকাচ্ছি। ওই বুড়োকে বলো! ওই যে পাগড়ি দিলুম, ওটা খুলে লম্বা করে ব্যাটাচ্ছেলের চারঠ্যাঙে

জড়িয়ে কুপোকাত করলেই চিতিং ফাঁক! মাইরি! কী করছ? দাও না টাকাটা। আজ পেটভরে ভাত খাব।'

টাকাটা পাগলাবাবুর হাতে দিলুম। উনি তক্ষুনি কেয়াঝোপের ভেতর দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। কর্নেলকে ওঁর কথাটা বললুম। কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, 'আমাকে কেয়াঝোপে ঢুকিয়ে উনি বলেছিলেন, ব্লাফ দিয়েছি। এ-ও হয়তো তা-ই। তবু চলো! গাধাটাকে দেখি।'

কেয়াঝোপগুলো ঢালু হয়ে নেমে গেছে। দু'জনে তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে বুনোফুলের জঙ্গলের ওধারে গাধাটাকে দেখতে পেলুম। কর্নেল চমকে উঠে বললেন, 'সত্যি তো গাধাটার গলায় ন্যাকড়ায় বাঁধা কী একটা ঝুলছে!' পাগলাবাবু গাধাটাকে কাতুকুতু দিয়ে লেজ টেনে উত্ত্যক্ত করছিলেন। বিরক্ত হয়ে গাধাটা বুনোফুলের ঝোপে ঢুকল। কর্নেল পাগড়িটার ক্লিপ খুলে লম্বা করে একটা প্রান্ত আমাকে ধরতে বললেন। অন্য প্রান্তটা তিনি ধরলেন। দশ-বারো হাত লম্বা পাগড়ি। কর্নেলের নির্দেশমতো সাবধানে গাধাটার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালুম। তারপর কর্নেল গাধাটার উল্টো দিক ঘুরে এসে আমার হাত থেকে পাগড়ির একটা প্রান্ত নিলেন এবং দুটো প্রান্ত ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই গাধাটা ঝোপের ভেতর কুপোকাত হল। নিমেষে কর্নেল তার ওপর গিয়ে চেপে বসলেন। তাঁর ওজনদার দেহের ভারে গাধাটা শুধু ঠ্যাং ছুড়তে থাকল। কর্নেল তার গলা থেকে ন্যাকড়ার পোঁটলা খুলে নিলেন। গাধার পিঠে— না, পেটে বসেই উনি ছিঁড়ে ফেললেন ন্যাকড়াটা। পলিথিনের একটা প্যাকেট বেরিয়ে পড়ল। প্যাকেটটার মুখ বাঁধা ছিল শক্ত কালো সুতোয়। একটু জায়গা চিরে ফেলে কর্নেল দেখলেন। তারপর বললেন, 'আবার যকের ধন!'

জিজ্ঞেস করলুম, 'কী ওটা?'

'একটা চেন আঁটা ফাইল।'

'কৌশল্যাদির সেই—'

'আবার কী? খুনী এটা এখানেই কোথাও বালিতে পুঁতে রেখে গিয়েছিল। পাগলাবাবু দু-দুবার চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছেন।'

গাধাটাকে মুক্তি দিয়ে কর্নেল ঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখে নিলেন। পাগলাবাবু ততক্ষণে কেটে পড়েছেন। তাঁকে কোথাও দেখতে পেলুম না।

গাধাটা নড়বড় করে পা ফেলে ঘাসজমির দিকে চলে গেল। কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত! আমি জিনিসগুলো নিয়ে ব্যাকওয়াটারের ধারে গিয়ে বসছি। দুই পায়ের ফাঁকে রাখব। তুমি হোটেলে গিয়ে আমার কিটব্যাগটা নিয়ে এস। ব্যাকওয়াটারের ব্রিজের কাছে নেমে আমাকে দেখতে পাবে। কুইক।

তখনই ঘাসজমি পেরিয়ে রাস্তায় গেলুম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে

পৌঁছুলাম। পূর্বাচল হোটেলের লাউঞ্জে তখন প্রায় জনশূন্য। বারের সামনে দু'জন প্রৌঢ় টুলে বসে বিয়ার পান করছেন। বিয়ার জগ দেখা যাচ্ছিল ওঁদের হাতে। ক্যান্টিনে একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। চা বা কফি খাচ্ছেন। বুঝলুম আর সব বোর্ডার এখনও সি-বিচে ঘুরছে। বৃষ্টিহীন সুন্দর বিকেলটা ক্রমে ধূসর হয়ে পড়ছে।

স্যুইটের দরজা খুলে কর্নেলের কিটব্যাগ এবং আমার বালিশের তলা থেকে হ্যান্ডব্যাগে রাখা লোডেড ফায়ার আর্মস প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ক বছর আগে চিৎপুরে একটা স্মাগলিং র‍্যাকেটের খবর দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় ফাঁস করার পর ক্রমাগত ফোনে আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। সেই সময় কর্নেলের পরামর্শ ও সুপারিশে এই অস্ত্রটার লাইসেন্স পেয়েছিলুম। কর্নেলের সঙ্গে বাইরে কোথাও গেলে এটা সঙ্গে নিয়ে যাই।

ব্যাকওয়াটারের ধারে কর্নেলকে খুঁজে বের করতে একটু দেরি হয়েছিল। কারণ উনি একটা ঝোপের আড়ালে বসেছিলেন। কয়েকটা জেলে নৌকো ভেসে ছিল। কিন্তু জেলেরা মাছ ধরতে ব্যস্ত।

জিনিসগুলো কিটব্যাগে ভরে কর্নেল ব্যাগটা যথারীতি পিঠে আঁটলেন। তারপর বললেন, 'চলো! ফিরে গিয়ে পকৌড়া আর কফি খাব। তারপর অন্য কিছু।'

হোটেলে ফিরে নবকে পকৌড়া-কফির কথা বলে কর্নেল সিঁড়িতে উঠছিলেন। সেই সময় কৌশল্যাদি নেমে আসছিলেন। বললেন, 'আপনাদের দু'জনকে দুর্গপ্রাসাদের ওখানে দেখছিলুম।'

কর্নেল হাসলেন। 'পাগলাবাবুকে দেখতে পাওনি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার কৌতুকের মেজাজ নেই। সত্যি বলছি একটু বিরক্ত হচ্ছিলুম। আপনি যেন সিরিয়াসলি আমার প্রব্লেমটা নেননি মনে হচ্ছিল।'

'পাগলাবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে দেখে?'

'হ্যাঁ। তারপর চোখে পড়ল, 'আপনারা পাগলাবাবুর সঙ্গে গাধাটাকে জঙ্গলে ঢুকিয়ে জোক করছেন।'

'এস কৌশল্যা! পকৌড়া-কফি খাবে এবং আমাদের সঙ্গে জোক করবে!'

কৌশল্যাদি কষ্টে হাসলেন, না কর্নেল। আমার কেন যেন বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে। সন্ধ্যা যত এগিয়ে আসছে, তত ঘরে একা থাকতে ভয় পাচ্ছি।'

'সেই জন্যই তো ডাকছি তোমাকে। এস।'

স্যুইটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কর্নেল বাতি জ্বাললেন এবং ফ্যান চালিয়ে দিলেন। আমি ব্যালকনির দরজা খুলে দিলুম। কৌশল্যাদি বিষণ্ণ মুখে বসলেন। কর্নেল কিটব্যাগের চেন টেনে বললেন, 'ম্যাজিক দেখাব কৌশল্যা! চোখ বন্ধ করো।'

কৌশল্যাদি বললেন, 'চোখ বন্ধ করছি না। মুখ ঘোরাচ্ছি।'

কর্নেল পলিথিনের মোড়ক চিরে চেন আঁটা লালরঙের ফাইলটা বের করে বললেন, 'এবার দেখ এটা কী?'

কৌশল্যাদি ফাইলটা তক্ষুণি তুলে নিয়ে চেন খুলে দেখার পর বালিকার মতো কেঁদে ফেললেন। 'আপনি সত্যি আমার পূর্বজন্মের বাবা!' কর্নেলের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে তিনি ফাইলটা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখ থেকে জলের ধারা নামছিল।

কর্নেল বললেন, 'কচি মেয়ের মতো কান্নাকাটির কী আছে? এবার যা বলছি, মন দিয়ে শোনো! ফাইলের কথা পুলিশকে বলে ফেলে টেনশন থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলে। কিন্তু তুমি পুলিশকে জানিয়ে দিও না যে ফাইল ফিরে পেয়েছ। কারণ পুলিশ জানতে পারলে আইনত ফাইলটা ওরা কাস্টডিতে নিয়ে যাবে। তারপর তুমি সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে তবে এটা ফেরত পাবে। কাজেই চেপে যাও। ওটা আমার কাছেই নিরাপদে থাকবে। তুমি কবে যাচ্ছ?'

'আমার তো আজ দুপুরে ডঃ আচারিয়ার সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল।'

'পুলিশ তোমার স্টেটমেন্ট নিয়েছে। ঠিকানা নিয়েছে। শ্রাবন্তী মার্ডার মামলায় তোমাকে ভবিষ্যতে কোর্টে আসতে হবে। তুমি কখন গেলে সুবিধে হবে, আমি আজ রাতেই জানিয়ে দেব। যাবার সময় তোমাকে ফাইল ফেরত দেব। তোমাকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসব। চিন্তা কোরো না।'

'শ্রাবন্তী বেচারির জন্য কষ্ট হচ্ছে। কে তাকে অমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল, তাকে এখনও ধরতে পারল না পুলিশ। আপনি কি কিছু আঁচ করতে পেরেছেন?'

কর্নেল তাঁর হাত থেকে ফাইলটা নিয়ে তাঁর প্রকাণ্ড ব্যাগে ঢোকালেন। তালা এঁটে দিলেন। তারপর বললেন, 'এখনও তার চেহারা স্পষ্ট হয়নি আমার কাছে। দেখা যাক্।'

দরজা নক করল কেউ। খুলে দেখি, নব পকৌড়া-কফি এনেছে। বললুম, 'আর একটা কাপ চাই নব!'

নব বলল, 'আনছি স্যার! থানা থেকে এক ভদ্রলোক এসে রিসেপশনে কর্নেল সায়েবের খোঁজ করছেন।' বলে সে ঘুরল। 'এই যে উনি এসে গেছেন!'

কর্নেল বললেন, 'মিঃ সাক্সেনা যে! পটনায়ক সায়েব জিনিসটা পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ স্যার। এই প্যাকেটে ভরা আছে। প্লিজ, এই রিসিটে সই করে দিন।'

কর্নেল সই করে দিয়ে মোড়কটা টেবিলে রাখলেন। মিঃ সাক্সেনা চলে গেলেন কপালে হাত ঠেকিয়ে। কৌশল্যাদি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ওটা?'

কর্নেল বললেন, 'ডঃ হাজরার কিছু রিসার্চ পেপার শ্রাবন্তীর জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল। উনি ফেরত পাওয়ার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। যাক্ গে, পকৌড়া আর কফি খাওয়া যাক। জয়ন্ত একটু পরে খাবে। নব কাপ-প্লেট আনুক।'

দরজা খোলাই ছিল। নব এল কাপ-প্লেট নিয়ে। তাঁর পেছনে ডঃ হাজরাকে দেখা গেল। উঁকি মেরে বললেন, 'কর্নেল সায়েব! পুলিশ আমার পেপার পাঠিয়েছে?'

'পাঠিয়েছে। একটু আইনের ফ্যাকড়া আছে মিঃ হাজরা! আপনি মিনিট পনের পরে ঘরে বসে আপনার পেপার ফেরত পাবেন।'

'ডঃ পাণ্ডে রাত সাড়ে আটটায় চেক-আউট করবেন।'

'এখনও সময় আছে। প্লিজ! একটু অপেক্ষা করুন গিয়ে।'

'ডঃ হাজরা রুষ্ট মুখে চলে গেলেন। আমি উঠে গিয়ে দরজা আটকে দিলুম। কর্নেল কফি খেতে খেতে ডঃ হাজরার রিসার্চ পেপারের প্যাকেটটা খুললেন। কোনো ফাইল নেই। একগাদা ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজে ডটপেনে কী সব লেখা আছে এবং মাঝে মাঝে কিছু স্কেচ আঁকা-- আমার পক্ষে তা দুর্বোধ্য।

কৌশল্যাদি মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়ে বললেন, 'বস্তাপচা তত্ত্ব। বহুবছর আগে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আণবিক জীববিজ্ঞানী জাক মোদ্ বলেছিলেন, এবার তিনি গবেষণাগারে মানুষ তৈরি করে ফেলবেন। তাই নিয়ে খুব হইচই পড়ে গিয়েছিল। তারপর অবশ্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং চর্চার সূত্রপাত হয়। কিন্তু এখন জিনোম প্রকল্প সেই চর্চার একটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ডঃ হাজরার রিসার্চ অবশ্য উদ্ভিদ নিয়ে। এটা আজকাল অনেক উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর কাজে লাগতে পারে। জানি না ডঃ হাজরার উদ্ভিদবিদ্যার ডিগ্রি আছে কি না।'

কর্নেল কাগজগুলো আগের মতো সাজিয়ে প্যাকেট করলেন। তারপর বললেন, 'আমি আসছি! তোমরা বসো। আর জয়ন্ত! একটু সাবধানে থেকো।'

তিনি ডঃ হাজরার প্যাকেটটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বললুম, 'চলুন দিদি, ব্যালকনিতে গিয়ে বসি।'

কৌশল্যাদি ব্যালকনিতে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ফাইল তোমরা কোথায় উদ্ধার করলে জয়ন্ত?'

বললুম, 'কর্নেলের মুখে সব শুনবেন। আমার কিছু বলতে মানা।'

কৌশল্যাদি শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কর্নেল সরকার আমায় মামা জগদীপ সিনহার বন্ধু। কর্নেলের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল আমেরিকার হিউস্টনে। মামা ওখানে একটা বড় তেল কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আরব গেরিলাদের একটা গুপ্ত সংগঠন সেই অয়েল কোম্পানির শোধনাগারে অন্তর্ঘাতের চক্রান্ত করেছিল। মামা কোন সূত্রে তা জানতে পেরেছিলেন। সেই সময় একটা বাঙালি ক্লাবে দৈবাৎ মামার সঙ্গে কর্নেলের আলাপ হয়। মামা প্রাণভয়ে কোম্পানিকে চক্রান্তের কথা জানাতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনি কথায়-কথায় কর্নেলকে জানান। কর্নেলের সামরিক জীবনের এক মার্কিন বন্ধু তখন ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের পদস্থ

অফিসার। কর্নেল তাঁর সাহায্যে গুপ্ত সংগঠনের সব লোককে পাকড়াও করেন। এবার আমি যখন চন্দনপুর-অন-সিতে প্রকৃতি পরিবেশ সম্মেলনে যোগ দিতে আসছি, তখন মামা কলকাতায় কর্নেলকে ফোন করে তাঁকে আমার কথা বলেন। কারণ আমার রিসার্চের ব্যাপারটা মামা জানতেন। মামা আমাকে পই পই করে নিষেধ করেছিলেন, যেন ঘুণাক্ষরে আমার গবেষণার ফলাফলের কথা কাউকেও না বলি। আমি আমার পেপার পড়ার সময় মাঝে মাঝে যে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলুম, তাতেই সম্ভবত কেউ জেনে ফেলেছিল আমি কোথায় পৌঁছে গেছি।'

বললুম, 'এতক্ষণে বুঝতে পারলুম কর্নেল কেন সম্মেলনে আসবার আগে এখানকার স্থানীয় পুলিশকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে রেখেছিলেন।'

এই সময় নীচের রাস্তায় পাগলাবাবুর চিৎকার শোনা গেল। 'চিচিং ফাঁক! চিচিং ফাঁ—ক্। এই দরজা খুলল। আলিবাবা ঢুকল।' তারপর মাথায় এক হাত কোমরে এক হাত রেখে তিনি সেই বিদঘুটে সুরে পদ্যটা গাইতে শুরু করলেন,

'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
মাইরি রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল
মাইরি সকলি ফুটিল
মাইরি মা কালীর দিব্যি
রাতি পোহাইল...'

তারপর হঠাৎ নাচ-গান বন্ধ করে পাগলাবাবু এই পূর্বাচল হোটেলের দিকে তর্জনী তুলে চেরা গলায় আবার চিৎকার করলেন, 'চিচিং ফাঁক! চি-ই-ই-চি-ই ই-ইং-ফাঁ-আঁ-আঁক্!'

দরজায় কেউ জোরে নক করছিল। দরজা খুলতে গিয়ে মনে পড়ে গেল কর্নেলের কথা। 'সাবধানে থেকো।' তাই আমার প্যান্টের ডান পকেটে পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবারের রিভলবারের বাঁট ডানহাতে ধরে বাঁহাতে দরজা খুলে দিলুম।

কিন্তু কোনো আততায়ী নয়, হোটেলের ম্যানেজার মিঃ মহাপাত্র। বললুম, 'কী ব্যাপার মিঃ মহাপাত্র?'

তিনি বললেন, 'কর্নেল সায়েব আছেন?'

'না। উনি সম্ভবত তিনতলায় ডঃ হাজরার স্যুইটে গেছেন। কিছু বলতে হবে?'

ম্যানেজার আস্তে বললেন, 'ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ পটনায়ক আমাকে ফোন করে জানালেন, প্লেন ড্রেসে কয়েকজন পুলিশ এখনই হোটেলে আসছে। একজন এস আই তাদের নিয়ে যাচ্ছেন। গাড়ি দূরে রেখে তাঁরা হেঁটে এখানে আসবেন। আইডেনটি কার্ড দেখাবেন এস আই। আমি যেন তাঁদের লাউঞ্জে ঢুকতে দিই। কর্নেল

সায়েবকে ওঁর বলা আছে। কিন্তু আমি ভয় পেয়েছি। আবার কী হাঙ্গামা বাধাবে পুলিশ। হোটেলের সুনাম নষ্ট হবে।'

কথাগুলো শুনে চাপা উত্তেজনা জেগেছিল মনে। মুখে নির্বিকারভাব ফুটিয়ে বললুম, 'কী আর করবেন মিঃ মহাপাত্র? হোটেলে একটা মার্ডার হয়েছে। একটু হাঙ্গামা সহ্য করতেই হবে।'

ম্যানেজার ভদ্রলোক জোরে শ্বাস ফেলে নীচে নেমে গেলেন। দরজা বন্ধ করে ব্যালকনিতে গিয়ে বসলুম। কৌশল্যাদি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে জয়ন্ত?'

বললুম, 'আবার পুলিশ আসছে শুনে ম্যানেজার বিব্রত বোধ করছেন।'

'পুলিশ আসছে। তার মানে তদন্ত করে কোনো নতুন তথ্য পেয়েছে ওরা।'

'সম্ভবত।'

কৌশল্যাদি একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'খুনী ফাইলচোর হয়তো এখনও এই হোটেলে আছে।'

'থাকতেই পারে। আমরা দুজন, আপনি, তারপর হাজরা দম্পতি এবং ডঃ পাণ্ডে এই ছ'জন বাদে আর পাঁচজন বোর্ডার এখন হোটেলে আছেন। সেই পাঁচজনের মধ্যে কেউ—' বলেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আচ্ছা কৌশল্যাদি, আপনি আজ সকাল বা দুপুরে হোটেলের আশেপাশে কোনো শিখ ভদ্রলোককে দেখেছিলেন?'

'কৌশল্যাদি একটু চমকে উঠে বললেন, 'শিখ ভদ্রলোক?'

'হ্যাঁ। মাথায় পাগড়ি, মুখে গোঁফ-দাড়ি, হাতে বালা আর কোমরে কৃপাণ। বেশ বলিষ্ঠ গড়ন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ব্যালকনি থেকে দেখেছিলুম, এই হোটেলের দক্ষিণে যে টিবিটা আছে, সেখানে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা একটা পথ আছে দেখেছি। সেই পথ ধরে একজন শিখ ভদ্রলোক নেমে আসছিলেন। তারপর নীচের রাস্তায় একটা অটোরিকশা ভাড়া করে ভদ্রলোক চলে গেলেন। তখন দশটা বা সওয়া দশটা হবে। কিন্তু কেন একথা জিজ্ঞেস করছ তুমি?'

একটু হেসে বললুম, 'যথাসময়ে জানতে পারবেন! কিন্তু কথাটা আগে যদি—'

'কী বলছ বুঝি না। আগে বলার কী কারণ ছিল? তোমরা তো জিজ্ঞেস করনি। তা হলে বলতুম।'

দরজায় কেউ নক করল আবার। দু'বার। তবু সতর্কভবে দরজা ফাঁক করে দেখলুম, কর্নেল দাঁড়িয়ে আছেন। সরে এলুম।

কর্নেল দরজা বন্ধ করে বললনে, 'ডঃ হাজরা তাঁর রিসার্চ পেপার পেয়ে খুব খুশি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে পাশেই ডঃ পাণ্ডের স্যুইটে গেলেন। তারপর ডঃ পাণ্ডে রিসার্চ পেপার দেখতে দেখতে হঠাৎ বললেন, ওই পাগলাবাবুটি সাংঘাতিক লোক। বিকেলে

দুর্গপ্রাসাদের ওখানে তিনি সমুদ্র দর্শনে গিয়েছিলেন। হঠাৎ পাগলাবাবু একটা পাথরের আড়াল থেকে উঠে একটা বাঁকা ছুরি বের করে হুমকি দিল, পকেটের টাকা আর রিস্টওয়াচ খুলে দাও। নইলে প্রাণে মারা যাবে। ডঃ পাণ্ডে মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাকে ঘড়ি খুলে দেবার ছল করে আচমকা একটা পাথর তুলে মারতে যান। তখন বজ্জাতটা পালিয়ে যায়।'

বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ দৃশ্যটা আমি ব্যালকনি থেকে দেখেছি।'

কর্নেল বললেন, কিন্তু ডঃ পাণ্ডে একটা আশ্চর্য কথা বললেন। সেই বাঁকা ছুরিটা নাকি একটা কৃপাণ। একমাত্র শিখরাই ওই কৃপাণ ব্যবহার করেন। কৃপাণের খাপটা একটা কাপড়ের ফিতের সঙ্গে বাঁধা ছিল। কথাটা শুনে আমি বললুম, ডঃ পাণ্ডে কি এলাকায় কোনো শিখ ভদ্রলোককে দেখেছেন? ডঃ পাণ্ডে চমকে উঠে বললেন, পার্বতীর মন্দিরে যাবার সময় তিনি হোটেলের দক্ষিণ দিকের জঙ্গলের পথে একজন শিখকে আসতে দেখেছিলেন।'

কৌশল্যাদি বলে উঠলেন, 'আমিও দেখেছি। ওই জঙ্গলের পথে সে আসছিল। জয়ন্তকে বলছিলুম।'

।। সাত ।।

কর্নেল কেন একটু হেসে উঠলেন। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চুরুট ধরালেন। আবার হাসতে হাসতে বললেন, 'অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি বলে বাংলায় একটা প্রবাদবাক্য আছে।'

কৌশল্যাদি বললেন, 'কেন একথা বলছেন?'

কর্নেল কিছু বলার আগে আমি বললুম, 'কিন্তু একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না। খুনী ফাইলচোর শিখ সাজতে গেল কেন? ইচ্ছা করলে তো সে যে-কোন জায়গায় গোপনে বাকি নাইলনের দড়িটা পুড়িয়ে ফেলতে পারত! পাগড়ি, দড়ি, কৃপাণ, কুর্তা, চুস্ত পাজামা আর বালা-টালা পরে শিখ সেজেছিল কেন?'

কর্নেল সোজা হয়ে বসে বললেন, 'আমাকে সে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। আমাকে মানে পুলিশকেও। আমার পাটিগণিত জয়ন্ত। তুমি আর আমি যখন ডানদিকে বালিয়াড়ির ঝাউবনের দিকে যাচ্ছিলুম তখনই সে আমাদের বিভ্রান্ত করার সুযোগটা নেয়। আমরা অন্যদিকে গেলেও সে একই সুযোগ নিত।'

'সুযোগ নিত মানে?'

'এটুকু তোমার মাথায় আসছে না? ইচ্ছে করেই সে পোড়ো লাইটহাউসের কাছে

বালিতে দড়িটুকু পুঁতে রাখতে ছুটে গিয়েছিল। সে লক্ষ্য করেছিল আমরা ওদিকেই যাচ্ছি। অমনি সে হোটেলের পেছনে টিবির জঙ্গল থেকে শিখ সেজে রাস্তায় এসেছিল। অটোরিকশা হোটেলের নীচে সবসময় পাওয়া যায়। অটোরিকশা লাইটহাউসের কাছাকাছি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে সে দড়িটুকু পুঁতে রাখতে গিয়েছিল এবং লক্ষ্য রেখেছিল, তোমার বা আমার চোখে যেন সে পড়ে। তাতে আমাদের কৌতূহল বা সন্দেহ জাগবেই। জেগেছিল বৈকি! তাই আমরা দেখতে গিয়েছিলুম, সে পোড়ো অজগর অধ্যুষিত লাইটহাউসের কাছে কী করছিল। সে বালি খুঁড়ে জায়গাটা আমাদের চোখে পড়ার মতো করে রেখেছিল। ওটাই তার ফাঁদ। আমরা ঠিকই ফাঁদে পড়লুম। একজন শিখকে খুনী ফাইলচোর সাব্যস্ত করে ফেললুম। অন্তত কয়েক ঘণ্টা সে আমাদের ভুল পথে ছোটাতে পেরেছিল। তাই না?'

'ঠিক। আপনি ঠিকই বলেছেন, অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি।'

কর্নেল হাসলেন। 'পাগলাবাবুকে কৌশল্যার সাহায্য করা উচিত। অন্তত তাঁকে কোন মেন্টাল হসপিটালে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। উনিই তোমার ফাইল উদ্ধার করেছেন।'

কৌশল্যা বলল, 'নিশ্চয় করব। উনি যদি আমার সঙ্গে যেতে চান— তো উনি কী করে আমার ফাইল উদ্ধার করলেন, একটু খুলে বলুন!'

কর্নেল সংক্ষেপে ঘটনাটা বললেন। তারপরই টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোন ধরে কর্নেল সাড়া দিলেন। তারপর ক্রমাগত 'হ্যাঁ, হুঁ, ওকে, ঠিক আছে' ইত্যাদি বলে গেলেন। তারপর ঘড়ি দেখে বললেন, 'সাড়ে সাতটা বাজে। চলো! আমরা নীচে যাই। ও সি মিঃ জেনা এবং ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ পটনায়ক সদলবলে আসছেন।'

কৌশল্যাদি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আবার কি জেরা শুরু হবে?'

কর্নেল বললেন, 'না। একটা নাটক দেখতে পাবে।'

বিস্মিত কৌশল্যাদি আমার দিকে তাকালেন। আমি বললুম, 'চলুন তো।'

কর্নেল তাঁর কিটব্যাগ নিয়ে বেরোলেন। বললেন, 'নাটকের সময় তোমরা চুপ করে থাকবে।'

আমরা দুজনে তাঁকে অনুসরণ করলুম। মনে মনে বললুম, 'আমি সাংবাদিক, চুপ করে থাকার গ্যারান্টি দিচ্ছি না।'

লাউঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকজন অচেনা লোক বসে আছে দেখলুম। বারের সামনে অল্প ভিড়। ক্যান্টিনে কয়েকজন বোর্ডার বসে চা বা কফি খাচ্ছেন। আমরা লাউঞ্জে রিসেপশনের কাছাকাছি এবং হোটেলের দরজার সামনাসামনি বসলুম। ম্যানেজার মিঃ মহাপাত্র এসে চাপা স্বরে বললেন, 'সঞ্জয়ের ডিউটি শেষ। কিন্তু তাকে যেতে দিইনি।'

কর্নেল বললেন, 'ওকে ওভার ডিউটির টাকা দেবেন। দেওয়া কর্তব্য।'

মিঃ মহাপাত্র একটু হেসে বললেন, 'আপনি যখন বলছেন, তা-ই দেওয়া হবে। তাহলে সঞ্জয় খুশি হবে।'

কিছু বুঝলুম না। কিন্তু এখন কর্নেলের হাবভাব অন্যরকম। বাঘ শিকারের ওপর ঝাঁপ দেবার আগে যেমন ঘাপটি পেতে বসে, ওঁর চেহারায় সেই ভঙ্গি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দুই পুলিশকর্তা এসে ঢুকলেন। লক্ষ্য করলুম, লনে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এসে দাঁড়াল। মিঃ জেনা এবং মিঃ পটনায়ক লাউঞ্জে দুটো খালি আসনে বসলেন।

অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। মনে হচ্ছিল আমরা চলেছি চূড়ান্ত বিস্ফোরণের জিরো আওয়ারে। কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। দশ... নয়... আট... সাত .... ছয় ... পাঁচ...

ডঃ হাজরা এবং তাঁর স্ত্রী নেমে এলেন। কোনোদিকে না তাকিয়ে তাঁরা ক্যান্টিনহলে ঢুকলেন। ম্যানেজার পাথরের মূর্তির মতো কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রিসেপশনে এক তরুণী টেলিফোন তুলে কাকে বলল, বিল পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যার! ব্যাগেজ আনতে লোক যাচ্ছে।'

বুঝলুম, ডঃ বিক্রমজিৎ পাণ্ডে চেক-আউট করছেন। পৌনে আটটা বাজে। ওঁর ট্রেন রাত ন'টার পর।

কিছুক্ষণ পরে একজন হোটেলবয় ডঃ পাণ্ডের ব্যাগেজ নিয়ে নেমে রিসেপশনের কাছে এল। তারপর ডঃ পাণ্ডে নেমে এসে বললেন, 'মিঃ মহাপাত্র। পেমেন্ট করব।'

ডঃ হাজরা ক্যান্টিনহল থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে এলেন। বললেন, 'এখনই চলে যাচ্ছেন?'

ডঃ পাণ্ডে বললেন, 'একটু সময় হাতে রেখে যাওয়াই ভালো।'

'অটোরিকশা বলা আছে তো?'

'বলা নেই। নীচে পেয়ে যাব।' বলে ডঃ পাণ্ডে পার্স থেকে টাকা বের করে ম্যানেজার মিঃ মহাপাত্রের হাত দিলেন। তারপর রিসিট নিয়ে পা বাড়ালেন। 'আপনার মিসেস কোথায় মিঃ হাজরা?'

'ওই তো ক্যান্টিনে বসে আছে।' বলে ডঃ হাজরা তাঁর স্ত্রীকে হাতের ইশারায় ডাকলেন।

মালবিকা হাজরা এসে বললেন, 'চলে যাচ্ছেন মিঃ পাণ্ডে? আমার খুব খারাপ লাগছে। কয়েকটা দিনের সুন্দর স্মৃতি মনে গাঁথা থাকল। বেড়াতে ভালোই লেগেছে। শুধু ওই হতভাগা মেয়েটির কথা কাঁটার মত বিঁধছে।'

ওঁরা পরস্পর নমস্কার করার পর ডঃ পাণ্ডে দরজার দিকে এগোচ্ছেন, হঠাৎ কর্নেল উঠে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এক মিনিট। আপনার সঙ্গে একটু

কথা আছে।'

ডঃ পাণ্ডের কাঁধে একটা ব্যাগ। কয়েক পা সরে গিয়ে তিনি ব্যাগটা দেখিয়ে হাসলেন। 'এতে কোন চোরাই মাল নেই কর্নেল সরকার!'

কর্নেল বললেন, 'চোরাই মালটা এখন আমার এই ব্যাগে শর্মাজি!'

ডঃ পাণ্ডে চাপা গর্জে বললেন, 'কী? শর্মাজি মানে? কী বলতে চান আপনি?'

'রাহুল শর্মাকে শর্মাজি বললে অপরাধ হয় না।'

মিঃ জেনা এবং মিঃ পটনায়ক এগিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর লাউঞ্জ থেকে কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশ এসে ঘিরে ধরল ডঃ পাণ্ডে-কে। আমি হতবাক। কৌশল্যাদিও তা-ই। এ কি দুঃস্বপ্ন?

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ পটনায়ক বললেন, 'রাহুল শর্মা। তোমাকে একটি হত্যা, চুরি এবং মিসপার্সোনিফিকেশনের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল।'

দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ 'ডঃ পাণ্ডে'-বেশী রাহুল শর্মার দুটো হাতে হাতকড়ি এঁটে দিল। বার, লাউঞ্জ এবং ক্যান্টিন থেকে বোর্ডাররা এসে ততক্ষণে ভিড় করেছেন। কিন্তু পুলিশের লোকেরা তাঁদের কাছে আসতে দিল না। সত্যিই এ এক জমাটি নাটক। আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি ডঃ পাণ্ডে একজন জাল মানুষ।

কর্নেল বললেন, 'রাহুল শর্মা! আজই আমরা খবর নিয়েছি, পাটনায় ডঃ বিক্রমজিৎ পাণ্ডে এখানে রওনা হওয়ার আগের দিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। আর সেই সুযোগে তাঁর ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট রাহুল শর্মা তাঁর তৈরি সেমিনার পেপার, অমন্ত্রণপত্র, এমন কি তাঁর এক প্যাকেট নেমকার্ড চুরি করে নিজেই ডঃ পাণ্ডে সেজে এখানে চলে আসে।'

আমি অবাক হয়ে শুনছিলুম। এবার সাংবাদিকতার অভ্যাসবশেই বলে উঠলুম, 'এই সম্মেলনে বহু বিজ্ঞানী এসেছিলেন। ডঃ বিক্রমজিৎ পাণ্ডেকে তাঁদের চেনার কথা। কেন তাঁরা চুপ করে ছিলেন?

কর্নেল মুখ খোলার আগেই ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর কল্যাণ পটনায়ক সহাস্যে বললেন, 'আপনি একজন সাংবাদিক। ঠিক প্রশ্নই তুলেছেন। কিন্তু এর উত্তর আমরা পেয়ে গেছি। টেলিফোনে পাটনায় ডঃ পাণ্ডের সঙ্গে আজ দুপুরে যোগাযোগ করেছিলুম। তিনি নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরে তাঁর ল্যাব-অ্যাসিস্ট্যান্টের কুকীর্তি জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না, সে চন্দনপুর-অন-সিতে প্রকৃতি পরিবেশ সম্মেলনে নিজেই ডঃ পাণ্ডে সেজে যোগ দিতে এসেছে। আমার মুখে কথাটা জানার পর ডঃ পাণ্ডে বললেন, তিনি এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত বিজ্ঞানীদের তালিকা দেখে তাঁর সহকারী এই রাহুল শর্মাকে বলেছিলেন, সরকার কী যে করছেন! অজানা-অচেনা সব ভুঁইফোড় বিজ্ঞানীদের নিয়ে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন করছেন।

ওঁদের মধ্যে বাঙ্গালোরের জিনোমবিজ্ঞানী ডঃ রঘুবীর আচারিয়ার নামটা তাঁর পরিচিত। তবে তাঁর সঙ্গে আজও তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। হ্যাঁ, অশোক সাঠের মুখে দিল্লির আরেক জিনোমবিজ্ঞানী ডঃ কৌশল্যা বর্মনের কথা তিনি শুনেছেন। সেই মহিলাবিজ্ঞানী নাকি জিনোমতত্ত্ব ঘেঁটে একটা বৈপ্লবিক ফরমুলা তৈরি করেছেন। অশোক সাঠে এ প্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলেন, ফরমুলাটা সত্য হলে ভারতের শত্রু রাষ্ট্ররা তো বটেই, বিদেশি রাষ্ট্রও কোটি-কোটি ডলার দাম দিয়ে কিনে নেবে। জয়ন্তবাবু! তা হলেই বুঝুন, কেন এই সুযোগ ছাড়তে চায়নি রাহুল শর্মা। স্বকর্ণে এইসব কথা ডঃ পাণ্ডের মুখে শোনার পর সে তক্কে তক্কে ছিল।'

কৌশল্যাদি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কর্নেল তাঁকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। অশোক সাঠে জাল ডঃ পাণ্ডেকে দেখে নিশ্চয় অবাক হয়েছিলেন। কারণ তিনি ডঃ পাণ্ডের এই সহকারীকে চেনেন। ঠিক এখানেই একটা গোপন চুক্তি হয়ে যায় দু'জনের মধ্যে। অশোক সাঠের উপস্থিতিতে কৌশল্যার সেই ফরমুলা ফাইল চুরি হলে কৌশল্যার সন্দেহ হবে অশোক সাঠেকেই। কৌশল্যা পুলিশকে তাঁর পেছনে ছোটাতো। তাই অশোক সাঠে চলে যাবার পর চুরিটা হোক। কৌশল্যা! এবার তুমি বলো, অশোক সাঠে চলে যাবার পরদিনও তুমি তোমার ফরমুলার ফাইল আছে দেখেছিলে কি না?'

কৌশল্যাদি বললেন, 'হ্যাঁ। ছিল। আপনাকে তো বলেছি কোথায় এবং কীভাবে রাখা ছিল।'

কর্নেল বললেন, 'অশোক সাঠে চলে যাবার আগে রাহুল শর্মাকে ওই ফাইল চুরির জন্য চরম তাগিদ দিতেই হোটেল দ্য শার্ক থেকে একজন কর্মীর হাতে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই কর্মী চিঠিটা তাঁর নির্দেশ অনুসারে সরাসরি জাল ডঃ পাণ্ডের হাতে দিতে এসেছিল। কিন্তু রিসেপশনে খোঁজ নেবার সময় কর্মীটি বাবু দণ্ডধর দাস যিনি দাসবাবু নামে পরিচিত, তাঁকে ভুল করে ডঃ পাণ্ডে নামের বদলে ডঃ পণ্ডা নাম বলে। মুখ আঁটা খামে শুধু লেখা ছিল ডঃ পাণ্ডে। এখন মজার ব্যাপার হল, চারতলার ২২ নম্বর সিঙ্গল স্যুইটে আছেন সম্বলপুরের জনৈক ডাক্তার নন্দকিশোর পণ্ডা। ওড়িশায় এই পদবি সুপরিচিত। অন্যমনস্ক দাসবাবু হোটেলবয় সঞ্জয়কে হোটেল দ্য শার্কের কর্মী অনন্তের সঙ্গে ডাক্তার পণ্ডার ঘরে পাঠান। সঞ্জয় এখানে উপস্থিত আছে। যথাসময়ে সে কথা বলবে। এইবার আমি ডঃ নন্দকিশোর পণ্ডাকে অনুরোধ করছি। বাকিটুকু তিনি বলুন।'

লাউঞ্জের একপ্রান্তে ভিড় থেকে একজন স্থূলকায় ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। তিনি আড়ষ্টভাবে কষ্টকর ইংরেজিতে বললেন, 'আমি খামে লেখা নামটা ভালো করে পড়িনি। পি এন ডি এই তিনটে হরফ চোখে পড়েছিল শুধু। কিন্তু খামের মুখ ছিঁড়ে

চিঠি পড়ে আমি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলুম না। লেখা আছে : লাল ফাইল। এক লক্ষ টাকা পুরস্কার। তলায় শুধু এ এস লেখা। কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হল এই অদ্ভুত চিঠি তাহলে অজিত সান্যালের দুষ্টুমি।'

কর্নেল বললেন, 'কে অজিত সান্যাল সে-কথা বলুন!'

ডঃ পণ্ডা বললেন, 'আপনারা যাকে পাগলাবাবু বলে জানেন, তিনি আমাদের সম্বলপুরেরই আরেক ডাক্তার ছিলেন। জানি না কেন তিনি গতবছর হঠাৎ পাগল হয়ে নিখোঁজ হন। তাঁকে চন্দনপুর-অন-সিতে বেড়াতে এসে আবিষ্কার করেছিলুম। উনি আমাকে দেখেই পালিয়ে যান। তো চিঠিটা পাওয়ার পর ধরেই নিলুম পাগল ডাক্তারের কীর্তি। আজ সন্ধ্যার একটু আগে উনি নীচের রাস্তায় নাচগান করছিলেন। তখন তাঁকে চিঠিটা খামসুদ্ধ দেখিয়ে---'

আমি সাংবাদিক বলে এখানে পরিচিত। তাই তাঁর কথার ওপর প্রশ্ন করলুম, 'আপনি চিঠিটা তা হলে রেখে দিয়েছিলেন কাছে?'

'হ্যাঁ। অজিত আমার বন্ধু। পাগল হয়ে আমার সঙ্গে কেন এই মজা করেছেন, জানতে ইচ্ছে করছিল। পাগলামি তো বটেই। তবু এই সুযোগে যদি তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। তাই তাঁকে চিঠিটা দেখালুম। বললুম, লাল ফাইল কী অজিত ? এক লক্ষ টাকা পুরস্কার আমাকে দেবে কেন? অজিত ডাক্তার আমার হাত ধরে টেনে রাস্তার এক ধারে নিয়ে গেলেন। বাচ্চা ছেলের মতো খিলখিল করে হেসে বললেন, গাধার গলায় লাল ফাইল ছিল। গাধাটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে। ওরে বাবা! এক লক্ষ টাকা পুরস্কার? এ কি কম কথা? চলে যাও মাথায় টাক মুখে দাড়ি সান্টা ক্লজের কাছে জানো না? সান্টা ক্লজ পুরস্কার দেয়? ওকে জিজ্ঞেস করলুম, কে তিনি? তখন অজিত ডাক্তার দুটো হাত গোল করে দুই চোখে রেখে বললেন, পাখি দেখে। প্রজাপতি পেলেই-- ওরে বাবা! খপ্ করে ধরে। আমি পালাই। অজিত ডাক্তার দৌড়ে বিচের দিকে গেলেন। তারপর আমার মনে হড়ল, যাঁর কথা অজিত বলল, তাঁকে তো আমি দেখেছি। এই হোটেলে তিনি আছেন। রিসেপশনের দাসবাবুকে নাম জিজ্ঞেস করলুম। উনি বললেন, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।'

কর্নেল বললেন, 'আমি তখন সবে আমার স্যুইট থেকে বেরিয়ে ডঃ হাজরার রিসার্চ পেপার নিয়ে তিনতলায় উঠছি, ডাঃ পণ্ডা বললেন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। ওঁর কথা শুনে খামসুদ্ধ চিঠিটা পকেটে রেখে দিয়ে বললুম, নীচে ক্যান্টিনে গিয়ে অপেক্ষা করুন। সব বুঝতে পারবেন। এবার হোটেল বয় সঞ্জয় তার কথা বলুক!'

ম্যানেজার মিঃ মহাপাত্র সঞ্জয়কে ঠেলে বের করে দিলেন। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ পটনায়ক ওড়িয়া ভাষায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হোটেল দ্য শার্কের অনন্তের সঙ্গে তুমি ডঃ পণ্ডাকে চিঠি দিতে গিয়েছিলে?'

সঞ্জয় ওড়িয়াতে জবাব দিল, হ্যাঁ স্যার! আমার সামনে অনন্ত ডঃ পণ্ডাকে চিঠি দিল।'

কর্নেল আমাকে অবাক করে ওড়িয়াতে তাকে বললেন, 'পরশু সন্ধ্যার আগে কী দেখেছিল, সেই কথাটা এবার বলো?'

সঞ্জয় ঢোক গিলে বলল, 'আমি চারতলার ২১ নম্বরে চা দিতে যাচ্ছিলুম। তিনতলায় ওঠার সময় দেখলুম, উনি ১৭ নম্বর স্যুইট থেকে বেরিয়ে একটা লালরঙের প্যাকেটের মতো জিনিস হাতে করিডর দিয়ে জোরে হেঁটে চলে গেলেন। তারপর নিজের ঘরে ঢুকলেন।'

ও সি রণবীর জেনা ধমক দিলেন 'উনি কে? দেখিয়ে দাও!'

সঞ্জয় জাল ডঃ পাণ্ডে অর্থাৎ রাহুল শর্মাকে তর্জনী তুলে দেখিয়ে দিলেন।

ওসি মিঃ জেনা হাসলেন। রাহুল শর্মা কোন দোকানে দড়ি কিনেছিল, তার খোঁজ আমরা পেয়েছি। কোন অটোরিকশাতে সে শিখের ছদ্মবেশে চেপেছিল, তাও আমরা খুঁজে বের করেছি।'

কর্নেল বললেন, 'আমাদের বিভ্রান্ত করে ভুল পথে ছোটাতে এই রাহুল শর্মা শিখ সেজেছিল। তিনি কিটব্যাগ থেকে শিখের ছদ্মবেশ বের করে মিঃ জেনার হাতে তুলে দিলেন।

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ পটনায়ক বললেন, 'স্থানীয় সমুদ্রবিজ্ঞানী উমেশ ঝার সঙ্গে এই জাল ডঃ পাণ্ডে ভাব জমিয়েছিল। ডঃ ঝা ডঃ পাণ্ডেকে কখনও দেখেননি। তিনি রাহুল শর্মাকে নিজের বাড়িতে খাইয়েছিলেন। ডঃ ঝা নিরীহ গোবেচারা ভালোমানুষ। তিনি তখন জানতেন না তাঁর সঙ্গে জাল ডঃ পাণ্ডের ভাব জমাবার উদ্দেশ্য কী? বছর দুই আগে সমুদ্রবিজ্ঞানের এক শিখকর্মী তাঁর অধীনে কাজ করতেন। বদলি হয়ে যাওয়ার সময় শিখকর্মী মহিন্দার সিংহ তাঁর বসের অভিপ্রায় অনুসারে একপ্রস্থ শিখপোশাক তাঁকে স্মারকচিহ্ন হিসাবে উপহার দিয়ে যান। সেই পোশাক ডঃ ঝার বসার ঘরের দেয়ালে সাজানো ছিল। নেমন্তন্ন খেতে গিয়েই তা জাল ডঃ পাণ্ডের চোখে পড়েছিল। আজ সকালে এই জাল ডঃ পাণ্ডে তাঁর বাড়ি গিয়ে কৌতুকের ছলে শিখ সাজতে চেয়েছিল। ডঃ ঝা কৌতুক ভেবেই তাকে শিখের পোশাক দেন। পাগড়ি, কুর্তা, চুস্ত পাজামা, কঙ্গন, বালা আর কৃপাণ। বাকি রইল গোঁফ-দাড়ি। গোঁফ-দাড়ি শর্মা সঙ্গে নিয়েই এসেছিল, যদি কোনো প্রয়োজনে লাগে। শিখ সেজে সে ডঃ ঝাকে বলেছিল, পূর্বাচলে গিয়ে সে তার বন্ধু ডঃ হাজরা— বিশেষ করে ডঃ হাজরার স্ত্রী মালবিকা হাজরার সঙ্গে কৌতুক করবে। তারপর ডঃ ঝার এই স্যুভেনির সে ফেরত দেবে।'

মিঃ মহাপাত্র বললেন, 'ডঃ উমেশ ঝা বেলা এগারোটা নাগাদ এসে আমাকে ডঃ

পাণ্ডের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি বললুম, ডঃ হাজরা সস্ত্রীক পার্বতীর মন্দিরে যাবেন বলছিলেন। হয়তো ডঃ পাণ্ডে তাঁদের সঙ্গেই গেছেন। শুনে ডঃ ঝা হাসতে হাসতে আমাকে ডঃ পাণ্ডের শিখ সেজে হাজরা দম্পতির সঙ্গে কৌতুক করার ব্যাপারটা বললেন। আমিও তখন এটা নিছক কৌতুক ভেবেছিলুম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, বেগতিক দেখতে শিখ সেজে পালাবে বলেই শর্মা পোশাক ফেরত দেয়নি ডঃ ঝাকে।'

কর্নেল বললেন, 'শিখ সেজে রাহুল শর্মা পার্বতীর মন্দিরে গিয়ে কোনো গোপন জায়গায় সম্ভবত উল্টোদিকে ঝোপের আড়ালে পোশাক বদলে মটকার ধুতি-চাদর পরে সাত্ত্বিক ভক্ত সেজে নিয়েছিল। তাকে নিয়ে-যাওয়া অটোরিকশার ড্রাইভার তখন তাকে চিনবে কেমন করে? যা-ই হোক, সে খালি অটোরিকশার ড্রাইভারকে তার জন্য অপেক্ষা করতে বলে কুড়ি টাকা অগ্রিমও দেয়। আপনি ঠিক ধরেছেন মিঃ মহাপাত্র। বিপদ বুঝলে শিখ সেজে পালাবে বলেই পোশাক লুকিয়ে রেখেছিল রাহুল শর্মা।'

মিঃ পটনায়ক বেটন নাচিয়ে রাহুল শর্মাকে বললেন, 'তোমার বাঁচবার কোনো উপায় নেই। সেই অটোরিকশার ড্রাইভার একজন সাক্ষী। ডঃ উমেশ ঝা-ও তোমার কীর্তি শুনে আগুন হয়ে জ্বলছেন।'

কর্নেল মুখে দুঃখ ফুটিয়ে বললেন, বেচারি কৌশল্যার ফাইলটাই পাওয়া গেল না। বেওয়ারিশ গাধাটা হয়তো সত্যি ওটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে। তা থাক্। আপদ গেছে। কী বলো কৌশল্যা?'

কৌশল্যাদি শুধু একটু হাসলেন।

'তা হলে আসামী নিয়ে আমরা এবার রওনা হই। এই নাটকের প্রধান কৃতিত্ব কিন্তু একান্তভাবে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের।'

বলে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ পটনায়ক, ও সি মিঃ জেনা এবং সাদা পোশাকের পুলিশের দলটি জাল ডঃ পাণ্ডে অর্থাৎ রাহুল শর্মাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তাপরই আবার এক নাটক। 'পাগলাবাবু' সবেগে লাউঞ্জে প্রবেশ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'চি-ই-চি-ইং ফাঁ-আঁ-আঁক্! বাব্বা! ইয়া মোটা পাথর তুলে ছুড়ে মেরেছিল দস্যু সর্দার। আলিবাবা বলেই বেঁচে গেছি। কাশিম হলে অক্কা পেতুম। আলিবাবা আর চল্লিশ চোরের গপ্প! মাইরি বলছি, এক কাপ কফি খেতে চেয়েছিলুম। বলে কী, তুই তো গাধার সঙ্গী। গাধা কি কফি খায়? হুঁ হুঁ। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি! আমি মাইরি তক্কে তক্কে ছিলুম। ব্যাটাচ্ছেলেকে শুনিয়ে গান গাইতুম,

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল

মাইরি রাতি পোহাইল

পাখি ডাকছে! সব ফর্সা! তোমার কারসাজি সব ফর্দাফাঁই! তাই কি না—

কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল
মাইরি সকলি ফুটিল

ব্যাটা খু-উ-ব জব্দ হয়েছে! চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছিলুম। কিন্তু হায়! হায়! অমন সুন্দর রোগাভোগা নিরীহ মেয়েটার গলায় ফাঁস আটকে মারলে গো! ও হো হো হো!'

বলে পাগল ডাক্তার অজিত সান্যাল দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

ডঃ নন্দকিশোর পণ্ডা তাঁর পেছনে ছুটে গেলেন। 'অজিতবাবু! অজিতবাবু! শুনুন!'

কৌশল্যাদি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওঁকে যে-ভাবে হোক আমি দিল্লি নিয়ে যাব। ওঁর চিকিৎসা করাব।'

কর্নেল ডঃ হাজরাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'শ্রাবন্তীর বাবা বা অন্য কেউ আসেননি?'

মিসেস মালবিকা হাজরা চোখ মুছে বললেন, 'হতভাগিনীর বাবা তো রুগী। আর কে আছে যে ছুটে আসবে? আমিই ওর ডেডবডি বুকে করে নিয়ে যাব। বেঁচে থাকতে মেয়েটাকে দু'চোখে দেখতে পারতুম না। এখন কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে!'

ডঃ হাজরা বললেন, 'আমি গিয়ে দেখি, কী করা যায়।'

মালবিকা প্রায় গর্জে বললেন, 'চু-উ-প্ করে বসে থাকো এখানে। আমিই যাচ্ছি। এক খুনে ডাকাতের সঙ্গে একা ঘুরে বেড়াতে পেরেছি। এটুকু পারব না? দরদ উথলে উঠেছে এতক্ষণে।' বলে স্থূলাঙ্গিনী ভদ্রমহিলা চটির শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন।

ডঃ হাজরা বিব্রতভাবে স্ত্রীকে অনুসরণ করলেন।

আমি কৌশল্যাদিকে বললুম, 'মানব চরিত্র সত্যি দুর্জ্ঞেয় কৌশল্যাদি!'

কৌশল্যাদি আস্তে বললেন, 'প্রথমে আমার সন্দেহ হয়েছিল ফাইল চুরির সঙ্গে শ্রাবন্তীর মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই। মিসেস হাজরাই হয়তো প্রতিহিংসাবশে শ্রাবন্তীকে ফাঁসে আটকে মেরেছেন।'

কর্নেল ভারি গলায় বললেন, 'আমি তৃষ্ণার্ত! কৌশল্যা! জয়ন্ত! চলো! ঘরে গিয়ে কফি খাওয়া যাক।'

নবকে ডেকে তিনি কফির অর্ডার দিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন। দরজা খুলে আমি ব্যালকনির দিকে এগিয়ে গেলুম। ব্যালকনির দরজা খোলার পর সমুদ্রের দিকে তাকালুম। রাতের সমুদ্র যেন পাগলাবাবুর মতো হাহাকার করছে। আর ভেসে আসছে ভিজে উদ্দাম হাওয়ায় ক্রমাগত মৃত্যুর নোনা ঠাণ্ডা হিম গন্ধ।...